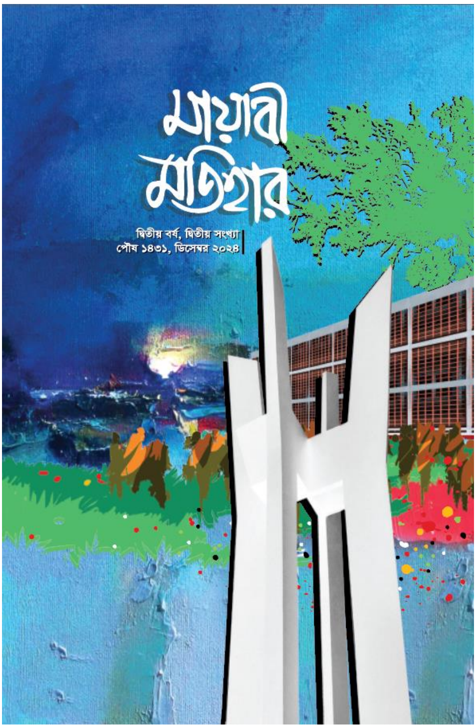


দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
পৌষ ১৪৩১, ডিসেম্বর ২০২৪

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিভাগ

# মায়াবী মতিহার

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
পৌষ ১৪৩১, ডিসেম্বর ২০২৪

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিভাগ

**সম্পাদক**
এলিনা খান

**সহযোগী সম্পাদক**
মোহাম্মদ মাহবুব আলম
সদ্যসমুজ্জ্বল

**প্রচ্ছদ ও নামলিপি**
আইয়ুব আল আমিন

**যোগাযোগ**
০১৭৬৫-৭৭৩৩১১, ০১৯৭০-৬৩২৫৪৩

ই-মেইল
m.mahbub789@gmail.com
sadyanilima@gmail.com

**শুভেচ্ছা মূল্য :** ৫০ টাকা

## সম্পাদকীয়...

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা বিভাগীয় কমিটির পথচলা প্রায় দুই বছর হতে চলেছে। ৩০ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঢাকা কমিটির যাত্রা শুরু। বিভাগীয় কমিটি গঠনের পরেই ১০ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে দুই বছরের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নিয়ে দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে এবং কর্মশালায় সদস্যদের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী দুই বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। কর্মশালায় সুপারিশকৃত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ঢাকা বিভাগের সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। ঢাকা বিভাগের গতিশীলতার কারণে অনেক নতুন সদস্য অ্যালামনাইয়ে যুক্ত হয়।

কর্মশালায় গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী ফল উৎসব, পিঠা উৎসব, পুনর্মিলনী সহ নানান কর্মকাণ্ড সফলতার সাথে সম্পন্ন হয় এবং ঢাকা বিভাগ সহ বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের সদস্যদের লেখা নিয়ে "মায়াবী মতিহার" নামে পত্রিকা অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। গল্প, কবিতা, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ নিয়ে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলে সবার কাছে প্রশংসিত হয়।

"মায়াবী মতিহার" এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর থেকেই দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের তাগাদা অনুভব থেকে এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা বিভাগের সদস্যদের লেখা নিয়ে দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো। আমাদের প্রত্যাশা অদূর ভবিষ্যতে "মায়াবী মতিহার" পত্রিকাটি সম্ভাবনাময় নতুন লেখকদের চারণভূমি হয়ে উঠবে।

"মায়াবী মতিহার" এর দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার লেখক ও সম্পাদনা পরিষদের সকলকে ধন্যবাদ এবং গ্রাফিক্স, অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি সুন্দর ও মানসম্মত একটি পত্রিকা প্রকাশ করার। অনিচ্ছাকৃত ভুল ক্রটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো।

আজ ঢাকা বিভাগের সদস্যদের নিয়ে "প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি ডিনার পার্টি" অনুষ্ঠানে পত্রিকাটি সবার হাতে তুলে দিতে পেরে এবং সদস্যদের জন্য ডিনার পার্টি আয়োজন করতে পেরে খুব ভালো লাগছে।

সবার কল্যাণ কামনা করি।

**এলিনা খান**

## সূচিপত্র

**শুভেচ্ছা বাণী**

জামিল রায়হান ৭
শহীদ ইকবাল ৮

বিভাগীয় কমিটি-ঢাকার বিশ মাসের কার্যক্রম ৯
ঢাকা বিভাগীয় কমিটি বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই ১০

**প্রবন্ধ**
বনলতা সেন: মায়াবী প্রকৃতির মানবী রূপ!!– আহসানুল কবির ১৩
পুনঃপাঠ : রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী– আযাদ কালাম ১৬
হেলাল হাফিজের কবিতা : বিষয় ও শিল্পরূপ– গৌতম দত্ত ১৯

**গল্প**
রঙ বেরঙ– ইকবাল হোসেন ৪২
কথোপকথন-১ : ইদ্রিস ও আমি– মিজানুর রহমান ৪৬
একটা অপারেশনের আত্মকাহিনী– মো. সোলাইমান আলী ৪৯
প্রণয়বিয়োগ বিরহী– ফারজানা মেহবুব শায়লা ৫২
লাইফ ইজ সো বিউটিফুল– সুমিকা পাল ৫৬
মানুষ– ফেরদৌস জ্যোতি ৬০

**কবিতা**
ইট কাঠ পাথর শহরে– জামিল রায়হান ৬১
কবিরাজ– আপেল আবদুল্লাহ ৬২
গৌরবের গ্রাফিতি– বেলায়েত হোসেন বাবলু ৬৩
চিঠি– নাসরিন পারবিন হীরা ৬৪
বিষাদময় সপ্তাহান্তের সন্ধ্যা– রমেন রায় ৬৫
ইচ্ছে ঘুড়ি– মো. শিমুল পারভেজ ৬৬

**জামিল রায়হান**
সভাপতি
বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

## শুভেচ্ছা বাণী

সময়কে তালুবন্দী করে আমাদের এগিয়ে যাওয়া। সাফল্য ব্যর্থতা আপেক্ষিক। কাজের ভেতরেই অপার আনন্দ। সত্য ও সুন্দরের চর্চার মূল্যও অপরিসীম। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কর্মসম্পাদনের ভেতরেই আমাদের শান্তি,স্বস্তি। এভাবেই পারস্পরিক ভালোবাসার সৌন্দর্য অনুসন্ধানে আমাদের ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া।
শিক্ষার কাল পেছনে পড়ে রইলো, এখন অভিজ্ঞতা অর্জনের বিস্তৃত পটভূমি। এখানেই এঁকে যেতে হবে জ্ঞান ও মানবিক বোধের চিত্রকর্ম। মনের রঙে তাকে রাঙিয়ে তুলতে হবে। জীবন ও জগতের নানা অনুসংগ, নানান আয়োজনে সমৃদ্ধ হবে আমাদের মেধা মননের পাললিক ভূমি। সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির মৌলিক জিজ্ঞাসা প্রতিফলিত হবে আমাদের যৎসামান্য কাজের ভেতরেও। জিজ্ঞাসার ভেতর দিয়ে আত্মানুসন্ধানের পথ বেয়ে আমরা খুঁজে পাবো আমাদের সঠিক ঠিকানা।

মায়াবী মতিহার নামে যে সৃজনকর্ম তার ভেতরেই থেকে যাবে আমাদের হৃদয় উৎসারিত ভালোবাসার ছাপচিত্র। হয়তো এর কলেবর ছোট, কিন্তু এর আকাশের সীমানা অনেক ব্যাপ্ত, বিস্তৃত। এর পটভূমিও সুদূরপ্রসারী। আমাদের ভাব ও ভাবনার রশ্মি সম্পাতে এই ছোট্ট চারাগাছ সময়ের পথ বেয়ে একদিন মহীরুহতে পরিণত হবে। আমাদের কর্ষিত ভূমি ফুলে ফসলে ভরে উঠবে সুনিশ্চিত।
আমাদের স্বপ্নের অনুসংগে মহৎ কিছু করবার জন্য নিত্য আয়োজন। এখানে পারস্পরিক হৃদ্যতা আর সম্প্রীতির বাতাবরণ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই যত্নশীল। আমাদের বিন্দু বিন্দু পরিচর্যার ভেতর দিয়ে হিতকর একটি সংগঠন গড়ে উঠবে।
বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন-প্রাক্তনীদের শুধুমাত্র একটি প্লাটফর্ম নয়, এটা নতুনতর জীবনচর্চার একটি সৃজনশীল ক্ষেত্র, তার যথার্থ প্রমাণ রেখে চলেছে ঢাকা বিভাগীয় কমিটি। তাঁদের প্রতি অকুণ্ঠ অভিনন্দন।
নতুন পথ নির্মাণে এই যে আয়োজন, তা আরো সুদূরপ্রসারী হোক। "মায়াবী মতিহার" আমাদের পারস্পরিক হৃৎ বন্ধনের উজ্জ্বল স্মারক হয়ে থাক। নতুন বছর-২০২৫ সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক-- সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি একরাশ শুভেচ্ছা।

**শহীদ ইকবাল**
সাধারণ সম্পাদক
বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

## শুভেচ্ছা বাণী

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই ঢাকা বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত হতে যাওয়া স্যুভেনির 'মায়াবী মতিহার' সময়ের ঘোড়ায় পা' দিয়ে বরাবরের মতো ভূমিষ্ঠ হলে আমরা সহজাত পুলকিত হওয়ার বিপরীতে এর রসদ ও অর্জিত উপাদানের হিসেবী খরচ মিলিয়ে দেখি যে, গোপনে সন্তর্পণে নিবিড়তায় বেশ কিছু কাজ তারা করে ফেলেছে– যা দিয়ে গুচ্ছ-মনের বিকশিত সতেজ আনন্দ ছড়িয়ে মিলিয়ে সৃষ্টিশীলতার বপু বৃদ্ধি করেছে আর মননে প্রকাশ করেছে কৃষ্টির উচ্চশীল উপলভ্য অহংকার। এগুলো অর্জন। একদন চিরতরুণের সকাশ সম্পৃক্তি এসব গড়ে দেয়। সব সংগঠন এটা পারে না। আমরা গড়ি, পারি এবং নির্মাণ করি। এ নির্মাণে ভাঙ্গা-গড়া থাকে কিন্তু পেছনে নয়, চলে সম্মুখে। যতো তুচ্ছই হোক এ প্লাটফর্মগুলো ভেতরে ভেতরে মনের সঙ্গে মনের, জীবনের সঙ্গে জীবনের সংযোগ ঘটায়। সংযোগের ভেতরেই প্রকাশমান হয় তার গাঠনিক-রূপ। নিশ্চয়ই এসব প্রয়াস সাফল্যের বার্তাবাহী।

পৃথিবীতে যখন গভীর অসুখ, তখন মানুষ মানবের তরে কী করবে? প্রতিকূলতা, অপহারী বিপরীত তো মানুষকে দমন করতে পারে না! যেটুকু আত্মায় আয়ু মানুষ বহন করে সেটা তো মূল্যবান। সেই সময়েই মানুষ নিজেকে চেনে, প্রকৃতির শান্ত-সমীরণে নিজেকে সমর্পণ করে, মেলায়, মিষ্টি বকুলের ঘ্রাণ নেয়, গ্রহণ-বর্জনের সুরে নিজে বাজায় অন্যকে বাজাতে চেষ্টা করে। এর তো কোনো ব্যত্যয় নেই। 'মায়াবী মতিহার' আবেগের-সংগ্রামের প্রতীকী প্রচ্ছদপট। সেটা তার সুরেই বেজে ওঠে। সে-কারণেই প্রচুর ব্যস্ততায়ও কেউ মুখ ফেরাতে পারে না। রচিত রচনায় অব্যয়ের শিহরণগুলো কোমল ও নিষ্কণ্টক বিছিয়ে দেয়। এ বিছানোর আনন্দ অসীম ঠিক এক জীবন বাঁচার মতো। আমরা বাঁচতে চাই। এভাবেই সকলে মিলে বসন্তের ইতিহাস গড়ে তুলতে চাই। জীবন যে জীবনের চেয়েও ততোধিক সুন্দর, সেটা কে অস্বীকার করবে? সে কী পরাভব মানে!

'মায়াবী মতিহারে'র সাফল্য কামনা করি। ঢাকা বিভাগীয় কমিটির জয় হোক।

## বিভাগীয় কমিটি-ঢাকার বিশ মাসের কার্যক্রম

সম্মানিত অ্যালামনাসবৃন্দ,
মায়াবী মতিহারের শুভেচ্ছা নিবেন।

৩০ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের ঢাকায় বসবাসরত সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন আরও নিবিড় করতে এবং নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে বাংলা পরিবারকে আরও বৃহৎ করার লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিভাগীয় কমিটি-ঢাকার যাত্রা শুরু হয় এবং ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়।
ঢাকা বিভাগীয় কমিটি গঠন হওয়ার পরে ১০ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে দুই বছরের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে এবং কর্মশালায় সুপারিশকৃত পরিকল্পনার প্রায় সবগুলোই বাস্তবায়ন হয়।
ইতোমধ্যে বিভাগীয় কমিটি-ঢাকা সদস্যদের নিয়ে ঢাকায় ফল উৎসব, পিঠা উৎসব, দুটি পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে এবং সদস্যদের লেখা নিয়ে "মায়াবী মতিহার" নামে পত্রিকার দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২১ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ইদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পঞ্চ কবির গান ও কবিতা নিয়ে "গীতি নকশা" এবং ২৫ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে পুরনো দিনের গান নিয়ে "জলছবি" নামে দুটি বিশেষ পরিবেশনা হয়।
বিভাগীয় কমিটি-ঢাকা ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে নতুন বছরের ডেস্ক ক্যালেন্ডার উপহার হিসেবে ডাকযোগে সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেয়।
দেশের দুর্যোগময় অবস্থায় সংকট মোকাবেলায় বিভাগীয় কমিটি-ঢাকা যথাসাধ্য কাজ করেছে। বিশেষ করে, ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলের স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় ঢাকা বিভাগের উদ্যোগে সাহায্য সামগ্রী নিয়ে ঢাকা বিভাগের একটি দল বন্যাদুর্গত এলাকায় গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ায়।
বিভাগীয় কমিটি-ঢাকা বিপদ-আপদে, সুখে-দুঃখে সদস্যদের পাশে থাকার এবং সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে এবং ইতোমধ্যে বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ে অনেক নতুন সদস্য যুক্ত করেছে।
আজ, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিভাগের সদস্যদের নিয়ে আয়োজিত "প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি ডিনার পার্টি" ও "মায়াবী মতিহার" এর দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন এবং সদস্যদের হাতে নতুন বছরে উপহার হিসেবে ডেস্ক ক্যালেন্ডার-২০২৫ তুলে দিতে পেরে খুবই আনন্দিত।
সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

**মোহাম্মদ মাহবুব আলম**
সাধারণ সম্পাদক
বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিভাগ

# ঢাকা বিভাগীয় কমিটি
## বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
## (২০২৩-২০২৪)

**এলিনা খান**
সভাপতি

**সৈয়দ মোজাম্মেল হক**
সহ-সভাপতি

**মোল্লাহ এম আমজাদ হোসেন**
সহ-সভাপতি

**মোহাম্মদ মাহাবুব আলম**
সাধারণ সম্পাদক

**জুবলী বেগম রানু**
কোষাধক্ষ

**শিমুল পারভেজ**
যুগ্ম-সম্পাদক

**মোহিত লাল সরকার**
যুগ্ম-সম্পাদক

**লিটন মোস্তাফিজ**
সাংগঠনিক সম্পাদক

**মো. ওবাইদুর রহমান**
দপ্তর সম্পাদক

মুহাম্মদ রবীউল আলম
কার্যনির্বাহী সদস্য

আবু মুসা বিশ্বাস
কার্যনির্বাহী সদস্য

আনোয়ারা পারভীন ঝর্ণা
কার্যনির্বাহী সদস্য

নাছরিন পারভীন হীরা
কার্যনির্বাহী সদস্য

শাহ মো. আমীর আলী
কার্যনির্বাহী সদস্য

মোছা. শামীম আরা
কার্যনির্বাহী সদস্য

শাম্মী আখতার
কার্যনির্বাহী সদস্য

মারুফা আখতার
কার্যনির্বাহী সদস্য

মো. আবু বকর সিদ্দিক
কার্যনির্বাহী সদস্য

মো. নজরুল ইসলাম
কার্যনির্বাহী সদস্য

হরেন্দ্রনাথ সিং
কার্যনির্বাহী সদস্য

মো. সাদ্দাম হোসেন
কার্যনির্বাহী সদস্য

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

## বনলতা সেনঃ মায়াবী প্রকৃতির মানবী রূপ!!

আহসানুল কবির

'বনলতা সেন' কবি রচিত তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯৪২ সালে প্রকাশিত। এই একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থই যদি কবি জীবনানন্দ দাশ রচনা করতেন তাহলেও তিনি সমমানের কবি খ্যাতি পেতেন। বনলতা সেন কবিতাটি কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা। বাংলা কাব্যসাহিত্যের দশটি কবিতার মধ্যে ১টি নিশ্চিতভাবে হবে। মানুষ একটি বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণী। তার ভিতর স্বপ্ন, জীবনবোধ প্রখর থাকে বলেই সে পৃথিবীর এক ভ্রমণকারী শান্তি অন্বেষাকারী জীবসত্তা। পৃথিবীর নবরূপ এবং তার সুবিধাভোগ, প্রকৃতির ব্যবহার সবই মানুষের সংগ্রামের ফল। এই সংগ্রাম যুগে যুগে চলমান। শান্তির অন্বেষায় মানুষ ঘুরছে তাবৎ পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার বছর ধরে। সেই ঘূর্ণায়মান মানুষের শান্তির ঠিকানা কবি বাংলাদেশের প্রকৃতিকে নির্বাচিত করেছেন। যার নাম এবং অবস্থান নাটোর। নামটি তিনি প্রতীকী অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কবিতাটির নির্মান শৈলীর বিবেচানও ভালো। তিনটি স্তবকে (৩×৬=১৮) কবিতাটি ১৮ লাইনের। শব্দের ছন্দময় ব্যবহার ব্যঞ্জনা, দ্যোতনা, অনুপ্রাস, অলংকারসহ বিবিধ চেতনা (সময় চেতনা ভূগোল চেতনা, প্রকৃতি চেতনা, ইতিহাস চেতনা, নারী চেতনা, প্রেম চেতনা এবং মৃত্যু চেতনা) বিদ্যামান। সুন্দর প্রকৃতির সাথে সুন্দর নারীর সমন্বয় দিয়ে প্রকৃতি এবং নারীর মেলবন্ধন করা হয়েছে। বনলতা+সেন=প্রকৃতি এবং মানবী। তার এই প্রবনতার কবিতা আরও আছে যেমন শঙ্খমালা, আকাশলীনা-শঙ্খ+মালা=শঙ্খমালা, আকাশ+লীনা= আকাশলীনা ইত্যাদি। আলোচ্য কবিতাটিতে সনেটের অনুরূপে তিনটি ভাবের সংযোগ সমাপ্ত হয়েছে।

**ক.** জীবন বাসনার অন্বেষা (উন্মেষ ভাব): হাজার হাজার বছর মানে অগণন সময়ের কথা (সময় চেতনা) অর্থাৎ একটি নির্দৃষ্ট সময় দ্বারা তিনি অনির্দৃষ্ট সময়কে বুঝিয়েছেন। এই মানুষ জীবন্ত অ্যাকটিভ মানুষ। কবি এখানে একা নন বহুবচনে মানুষেরা। হাজার বছর ধরে মানুষই পথ হাঁটছে বিশ্বময় প্রকৃতিময় (প্রকৃতি চেতনা)। তার অন্বেষা শান্তি এবং সুন্দরের সান্নিধ্য লাভ। 'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকার মালয় সাগরে/অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার আশোকের ধূসর জগতে। জিওগ্রাফিক্যাল একটি বর্ণনার দ্বারা কবি ভ্রামণিক একটি গল্প সাজিয়েছেন। যে গল্পে বাস্তবতার একটা প্রমাণ রয়েছে যা ইতিহাস সম্মত। সিংহল পূর্বের শ্রীলংকার নাম। মালয় সাগর, বিম্বিসার, আশোক এসবই ইতিহাস সর্মথিত প্রসিদ্ধ। বিম্বিসার হচ্ছেন হর্যন্ধ বংশের প্রসিদ্ধ রাজা। তিনি বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের হাতে নিহত হন। অশোক হচ্ছেন মৌর্য বংশীয় সম্রাট। এদের সেই সব স্মৃতির শহর অভিশপ্ত ভাবে পতিত হয়ে আছে সেখানেও মানুষ ঘুরেছে বসতি নিয়েছে এবং শান্তি খুঁজেছে  (ইতিহাস চেতনা)। পৃথিবী ঘুরার সাধ হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে! এই কোনখানে ঘুরতে ঘুরতে কবি মানুষের উপস্থিতির শুধু দুঃখময় স্মৃতিধূসর জীবনের সাক্ষী হয়েছেন। অনেকদিন ধরে এই ঘুরা এই ঘুরা মানুষের পৃথিবী ঘুরা (ভূগোল চেতনা)। একটি উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করে ঘুরা। সেই ইচ্ছার পথ পরিশ্রমের এবং দীর্ঘ সময়ের বলে কবির মনে এবং শরীরে ক্লান্তি নামে।

'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন' ।

অজস্র ক্লান্তি, সাগর এখানে তুল্যমূল্য হয়েছে গতিশীল সাগর যেমন জলের তোড়ে ঢেউয়ের তোড়ে ফেনাময় হয় ভ্রাম্যমান জীবনের ক্লান্তিময় শরীরটিও তেমনি শান্তিতে ঘর্মাক্ত। এমন হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় কবির মনে শান্তি এবং সম্ভবনার সৃষ্টি হয়। 'আমারে দুদন্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন'।

**খ.** প্রাপ্তিবোধ (ভাবের বিস্তৃতি): বোধ দুভাবে মানুষের জীবনে আসে। এক মৌলিকবোধ যা আছে। দুই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সূত্রে যা বাস্তব বিস্তৃতি যোগ্য। দ্বিতীয় পর্যায়ের বোধই বনলতা সেন কবিতায় দ্বিতীয় স্তবকে প্রত্যক্ষভাবে বিবৃত হয়েছে।

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'।

যে বনলতা সেন প্রকৃতির মধ্যে থেকে নির্বাচিত হলো এবং বেরিয়ে আসলো তার একটা মানবী রূপ দ্বিতীয় স্তবকে দেয়া হলো। এই মানবী সুন্দরী তার চুলের দীর্ঘতা দিয়ে কবি তার দীর্ঘ সময়ের অবস্থান বুঝিয়েছেন। তিনি সেই সাথে ইতি হাসের পেক্ষিত দিয়ে তাকে ঐতিহাসিক নারীর মর্যাদায় উদ্ভাসিত করেছেন। বিদিশা ভারতবর্ষের প্রাচীন মালব দেশের নগরী এই নগরী এখন অব্যবহৃত পতিত এবং স্মৃতিমুক্ত অন্ধকার সময়ের সাক্ষী। সেই অন্ধকারই নিশা, গভীর কালো তেমনি চুলের রূপ। এসবই হচ্ছে কাব্যকথা 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' মুখের বর্ণনায় তিনি একইভাবে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এনেছেন শ্রাবস্তীও ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রাচীন নগরী। এই নগরী পূর্বকালে প্রাকৃতিক সুন্দর্যে ভরপুর; তার সেই সৌন্দর্যই হচ্ছে নগরীর সুনাম। সেই সুনামের সাথে সঙ্গতি রক্ষায় কবি বনলতা সেনকে শ্রাবস্তীর অনুরূপ করে নিয়েছেন। এতেই পথিক জীবনে ক্লান্তি দুর হয় এবং প্রশান্তি আসে। কেমন সে প্রশান্তি, কেমন সে প্রাপ্তি?

'অতিদূর সমুদ্রের পর হাল ভেঙ্গে যে নাবিক হারিয়েছে দিশা/ সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর/ তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে' এই প্রাপ্তি প্রাশান্তি হচ্ছে বিপদ থেকে উদ্ধারের এটাই ইউরেকা ইউরেকা ধনির ডিসটিনি। বিপদগ্রস্থ নাবিকের কাছে সবুজ ঘাসের দ্বীপ যেমন বাঁচার বাস্তবতা ঠিক সেভাবেই শান্তির নেশায় অবিরাম ভ্রামণিক মানুষের জন্যে নাটোরের বনলতা সেন আশ্রয় এবং বিশ্রাম। সারাদিন শস্যের গুলন খেয়ে যে পাখিরা মাঠ চষে বেড়াই সেই পাখিরা ফেরে সন্ধার নীড়ে। এই নীড় মায়াময়ী প্রত্যাশায় অপেক্ষায় থাকে। তেমনি দীর্ঘ দিনের মানুষ বর্জিত বনলতা সেন মানুষের অপেক্ষায় থেকেছে। যখনই কবি ভাবনার এই মানুষেরা কাব্যিক সূত্রে ইতিহাস পরিক্রমায় প্রাকৃতিক ভূগোলের সীমারেখায় বনলতা সেনকে খুঁজে পেয়েছে তখনই মানবী নারী হয়ে আবেগী কণ্ঠে মানুষের সম্মান জানিয়ে বলে উঠেছে' এতদিন কোথায় ছিলেন। মানুষের প্রতি দাবী নিয়ে তার এই প্রশ্ন। এই প্রশ্নই বলে দেয় মানুষ প্রকৃতির চিরস্থায়ী সর্ম্পকের কথা। এই হচ্ছে প্রকৃতি থেকে নারীতে রূপান্তর বা সমন্বয়। এমনি সমন্বিত দুটি সত্তার নারীরুপে এবং প্রকৃতির রূপকে কবি অখন্ড ভেবেছেন। এদের মাধ্যমেই পুরুষ তাদের শান্তি এবং ক্লান্তি দুর করতে পারে। এদের ছায়াতলে জীবনের বিশ্রাম যুগ যুগান্তরের। এদেরও অপেক্ষা থাকে পথিকের তাই চলন্ত শান্তি অন্বেষী পুরুষ যখন তার আরধ্য মানসিকে পেয়ে যায় তখন সবকিছু মিটমাট সর্মপন-সমঝোতা ঘটে যায়।

**গ.** প্রত্যাবর্তন জীবনাবসান (ভাবের সমাপ্তি): তৃতীয় স্তবকে জীবনের পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত রয়েছে। জন্ম জীবন-ভ্রমণ প্রেম পরিশ্রম সম্পর্ক মায়া সব কিছুই আবার দিন শেষে স্মৃতি হয়ে যায়।

'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন/সন্ধ্যা আসে'। এই সন্ধ্যা মৃত্যুর রঙ, শিশিরের শব্দ মানে অজান্তে মৃত্যুর নীরব আগমন। মৃত্যুর চোখে পৃথিবী আলোহীন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চোখ বন্ধ হলে কেবলি মূহুর্তের জন্য পান্ডুলিপির মতো অতীত স্মৃতিময় হয়ে উঠে। এই স্মৃতি খন্ডিত, জোনাকি পোকার মতো টিমটিমে আলোর মতো ক্ষুদ্র আকারে জ্বলে। এরপর জীবন মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়।
'সব পাখি ঘরে আসে- সব নদী- ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন' দিনের আলো শেষে পাখিরা যেমন নীড়ে ফিরে, তেমনি জীবন শেষে মানুষও প্রত্যাবর্তন করে ফিরে মৃত্যুতে। এই মৃত্যুর ভূমি, জগৎ, জীবন, পৃথিবী সবই প্রকৃতি। তার ভেতরেই জীবনের খেলা যেমন মৃত্যুরও বেড়ে উঠা তেমন। অর্থাৎ প্রকৃতির জীবন প্রকৃতিতেই সর্মপন। আর এই আয়ুষ্মান প্রকৃতিই হচ্ছে বনলতা সেন। 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'। মৃত্যুর অন্ধকারময় জীবনের যে আঁধার তাওতো প্রকৃতি মাটি, ছাই মৃত্যুকে নিয়ে মুখোমুখি সাথি হয়।

## পুনঃপাঠ : রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী

আযাদ কালাম

শিলাইদহ-কুঠিবাড়ির দোতলার বারান্দায় সিলিং-এর সাথে সংরক্ষিত আছে রবীন্দ্রব্যবহার্য একটি নৌকো। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৯১তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোটে (শিলাইদহ) বসে 'সোনার তরী' নামীয় যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন সে বোট কি এই নৌকো? উত্তর ইতিবাচক-নেতিবাচক যাই হোক, প্রশ্নটি নিতান্তই গৌণ। তবে শত বছরের অধিককাল নৌকোখানা রক্ষিত আছে এবং আরো বহুকাল থাকার সম্ভাবনাকে গৌণ বলে উড়িয়ে দেয়ার যো নেই। জোড়াসাঁকো কিংবা শান্তিনিকেতনে রক্ষিত স্মৃতিচিহ্নের দীর্ঘায়ূ বিবেচনায় না রেখেও বলা যায়, বাংলাদেশের প্রত্যন্তে বৈরি জলহাওয়া আর সময়ের কামড় সহ্য করেও অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ রবীন্দ্রস্মৃতি আরো বহুকাল টিকে থাকবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ 'সোনার তরী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা এবং সৃষ্টির টিকে থাকা না থাকার যে দর্শন উপস্থিত করেছেন তা কি একেবারেই অকাট্য? 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা। / কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।'

প্রশ্ন হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ কতোটা সংশয়বাদী? প্রতিকুলতার বাইরে কি কিছু আছে? মাত্র তিরিশ বছরের তারুণ্যেই এমন সংশয়ভরা চিত্তে রবীন্দ্রনাথ অমরত্বের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। সোনার তরী'র পর চার বছরের মাথায় তিনি লেখেন– 'আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,/ আজিকার কোনো রক্তরাগ–/ অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে / তোমাদের করে,'

বেঁচে থাকবার বাসনা চিরন্তন। রবীন্দ্রনাথ হয়তো সর্বজনীন সে নিহিত বাসনাকেই মূর্ত করবার প্রয়াশ পেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে যে সংশয় এবং অমরত্বের পিপাসা তার প্রশ্নাতীত সর্বজনীনতার পরও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের তাজা উপস্থিতি অস্বীকারের কোনো উপায় আছে কি? রবীন্দ্রমানসে প্রবণতাটি নেতিবাচক বিবেচনায় দেখার কোনো কারণ নেই। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক, অমরত্বের পিপাসা আর মৃত্যুচিন্তা কখনোই এক নয়।

সরাসরি 'সোনার তরী'তে ফেরা যাক। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রবীন্দ্রপ্রতিভার গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'সোনার তরী', যা রবিজীবনের প্রভাতবেলায় রচিত। শুধু কবিজীবনের প্রভাতবেলা নয়, কাব্যপরিবেশেও প্রতীকায়িত এ প্রভাত। 'গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা।/এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা ॥/'।

ব্যক্তি নিঃসঙ্গ, কবি নিঃসঙ্গ, রবীন্দ্রনাথও কি নিঃসঙ্গ? ধরে নেয়া যাক, অন্তর্জগতে সবাই নিঃসঙ্গ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাতে প্রতিকুলতার বিরুদ্ধ সংগ্রামে অমরত্বের আশায় ব্রতি হলেন। 'একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা–/ চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।' একজন তিরিশি তরুণের কবিতার খেত-খামার ছোটো হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তরুণের চারপাশ বাঁকাজলের প্রতিকূলতায় পূর্ণ কেন? তাও আবার সে তরুণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এ কি রবীন্দ্রনাথের কোনো অজানা বাস্তবতা নাকি নিছক কাব্যবিলাশ? দুই-ই স্বস্তিদায়কভাবে গ্রহণ করবার কোনো কারণ নেই। কেউ কেউ বিরক্ত বোধ করতে পারেন, কবিতাকে কবিতা হিশেবে সর্বজনীনতার প্রতীকি

মাপকাঠিতে না দেখে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এ টানাহেচড়ার কারণ কি? এহেন প্রশ্নের জন্যে বলি, যে কোনো দৃষ্টিতে রচনা পাঠ করবার অধিকার পাঠকের সবসময় শতভাগ সংরক্ষিত।

আবার 'সোনার তরী'তে দৃষ্টিপাত, 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!/ দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।' একজন প্রতিকুলতার যাত্রী, বিপদ সঙ্কুল একজন নিঃসঙ্গ তরুণ অচেনা হলেও সঙ্গীপিপাসায় ব্যাকুল থাকবেন– এখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এবং প্রত্যাশার স্বাভাবিকতা সর্বজনগ্রাহ্য। আগন্তক যদি হন রসিকজন তাহলে উল্লাস বোধ করাটাও স্বাভাবিক। এমন পরিবেশ-পারিপার্শিকতায় অচেনাকেও অতিচেনা মনে করে বুকে জড়িয়ে ধরার আকুলতা– তরুণ কবির সুস্থ বিকাশকেই নির্দেশ করছে।

পরের চরণেই মোহভঙ্গের হতাশা–'ভরা পালে চলে যায়, কোনো দিকে নাহি চায়,/ ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু ধারে–' হতাশার আশা জাগানিয়া অচেনা বন্ধুজন যখন অচেনাই থেকে যায়, যখন দেখেও অদেখার নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে চলে যায়, তখন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মতো সবকিছু নিরুপায় হয়ে আছাড় খাবে– এটাই চিরন্তন অন্তরাত্মার মূর্ত রূপ। মনোজগতের অতি সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলি সেই বয়সে এমন নিখুঁতভাবে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে ধরতে পেরেছিলেন তাই নয়, তিনি সে সব উপলব্দির সফলতম চিত্রকল্প উপস্থাপন করেছিলেন 'নিরুপায় ঢেউ ভাঙ্গা'র মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথ হতে চলেছেন– এ লক্ষণগুলি তারই পূর্বাভাস– এটা বলে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

হতাশায় ডুবতে ডুবতেও মানুষ আশায় বাঁচতে চায়, রক্ষা করতে চায় নিজের উত্তরাধিকার– 'ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে?/ বারেক ভিরাও তরী কূলেতে এসে।/ যেয়ো যেথা যেতে চাও, যারে খুশি তারে দাও,/ শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে/ আমার সোনার ধান কূলেতে এসো॥/' নারি-পুরুষ বলে নয়, প্রতিটি প্রাণেরই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য মাতৃত্ব। যার অপর নাম পিতৃত্বও বটে। অর্থাৎ উত্তরাধিকারকে রক্ষা করার প্রাণান্তকরতা। রবীন্দ্রমানসে এ প্রবণতাই ক্রিয়াশীল হতে দেখা যাচ্ছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নিজেকে প্রবাহিত দেখবার বাসনা থেকেই প্রবণতাটির উৎপত্তি। তুমি যেখানেই যাও, যার কাছেই যাও– আমার ফসল, আমার বীজ, আমার উত্তরাধিকার যদি সেখানে পৌঁছে তবে সেতো আমিই।

'যত চাও তত লও তরণী-'পরে।/ আর আছে?– আর নাই, দিয়েছি ভরে/ এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে/ সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে–' কর্ম কিংবা কর্মফল আপন ভোগের জন্যে নয় কখনই। 'নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল/ তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল'। পিতা পরম যত্নে কন্যার লালন করেন উপযুক্ত পাত্রে দান করবার জন্যেই। কালপ্রবাহের সোনার স্রোতে নিজের ছায়া প্রক্ষিপ্ত করবার বাসনায় রবীন্দ্রনাথ জীবনের অর্জনটুকু উজার করতে পারার নিঃস্বতায় সুখি হতে চান। নিঃস্ব হতে পেরে আনন্দের গুঢ়ার্থ এখানেই।

'এখন আমারে লহো করুণা ক'রে॥' – এই হলো মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়া নিঃস্বদের কাঙালপনা। হিতাহিত ভুলে যাওয়ারা চিরকাল এ সকল কাঙালপনায় নিজেকে খেলো করেন। কবিতায় কাঙালপনার উপস্থাপন রবীন্দ্রজীবনের ঊষালোকে তাঁর শক্তির স্মারক।

শিল্পমাধ্যমে এরকম সূক্ষ্মতম সফল উপস্থাপন আস্বাদনকারীকে বিমোহিত করতে বাধ্য। এখানে খুশি হবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। তবে হতাশার সিংহদুয়ার এখানেই অপেক্ষমান। হতাশার শেষ পঙক্তি প্রকাশের পূর্বলগ্নে সোনার নৌকোর দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক– 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী/ আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।/ শ্রাবণগগণ ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,/ শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি–' কাঙগালের ট্রাজেডিটা এখানেই। তারা বুঝতে চান না বা বুঝতে পারেন না নিজের চাওয়া-পাওয়া-গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথের সকল অর্জন এখানেই উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ারে পর্যবশিত হয়। দান চেয়ে মান যাবার দশা রবীন্দ্রনাথের। ঠাঁই কি চেয়ে পাবার জিনিস? কর্মের কর্মফল অনিবার্য। কালের কামড় ক্ষমাহীন।

তিরিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ তিরিশ পঙক্তির অন্তরবয়ানের শেষ বিন্দুতে 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি–/ যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী॥' ব্যক্ত করার মধ্যে আপাত চোখে সব অভিনব এবং ঠিকঠাক মনে হবার পরও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের নিঃস্বতা, হাহাকার তাঁকে ছোটো করে দেয় বৈকি। সোনার তরী'র আদ্যপান্ত জুড়ে টিকে থাকবার, প্রকারান্তরে অমরত্ব লাভের করুণ বাসনার আকুতি রবীন্দ্রজীবনের শেষ প্রহর পর্যন্ত পাঠককে সহ্য করতে হয়েছে।

প্রতীকায়িত সোনার ফসল টিকে থাকবে, কৃষক নয়– এ অনুমানটিও ক্ষণকাল স্থায়ীত্ব পেয়েছে। সেই ক্ষণকালে শুধু তাঁর কর্মই নয়, ব্যবহার্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ অন্য সবকিছুর সাথে তাঁর বোটটিও কি রক্ষিত হয় নি? তবে কাল বিচারে তা ইতিহাসের উপকরণ মাত্র। বলা আবশ্যক, চর্যাপদ এবং চর্যার পদকর্তারাও আজ তাই-ই। চণ্ডিদাস-বিদ্যাপতিদেরও একই পরিণতি। এ পরিণতি থেকে রবীন্দ্রনাথের মুক্তি মিলবে এমন আশা করবার কোনো কারণং নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর নবপ্রজন্মের কাছে ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাথ গতিহীন ক্লান্তিকর হিশেবে দাহ্য হতে শুরু করেছে। মৃতশিশুকে বুকে নিয়ে আদর-যত্নে নিজের সাথে প্রবঞ্চনা করা গেলেও মৃতের পচন রোধ করা যাবে কি?

## হেলাল হাফিজের কবিতা : বিষয় ও শিল্পরূপ

গৌতম দত্ত

বিশ শতকের ষাটের দশকে অখণ্ড পাকিস্তানে চলে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন। পূর্ব পাকিস্তান তখন প্রায় পুরোপুরি অবরুদ্ধ। এই অবরুদ্ধতার মধ্যে ষাটের দশকের বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে দু'ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। প্রথমত 'বায়ান্নর রক্তাক্ত উজ্জীবন এ-সকল কবির চেতনায় যে সংরক্ত আবেদন নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিলো, হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে ও ব্যক্তিক নিরাপত্তার প্রশ্নে ষাটের দশকে তা অনেকের মধ্যেই সৃষ্টি করলো আত্মমুখী প্রবাহ-স্রোত।' (রফিকউল্লাহ, ২০০২: ২২) অন্যদিকে 'ষাটের দশকের কবিতার প্রধান প্রবণতা দ্রোহ, বিপ্লব, বিদ্রোহ। ষাটের দশকের বাংলাদেশের রাজনীতির উত্তাল ঘটনাতরঙ্গ এ দশকের সব কবিকেই ছুঁয়ে গেছে।' (মামুন রশীদ, ২০১৫: ১৪) ফলে এ দশকের কবিদের প্রধানত দুটো বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়–অবরুদ্ধতাসংক্রান্ত আত্মমুখিনতা ও সেই অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠা। ব্যক্তি ও সমষ্টিগত এই দুই বাস্তবতার ভেতর হেলাল হাফিজ কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এ কারণেই তাঁকে বলা হয় 'নিভৃতচারী সোচ্চার কবি' (সৌমিত্র, ২০১৪: ৪৭)। হেলাল হাফিজের কবিতার জগতে প্রধানত এ দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ব্যক্তিগত প্রেম, সুখ, শোক, বিরহ ও নিঃসঙ্গতার পাশাপাশি দ্রোহ আর প্রতিবাদে তিনি এক প্রবাদপ্রতিম কিংবদন্তি কবিপুরুষে পরিণত হন।

১.

আত্মমুখী ভাবচেতনায় ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের প্রাধান্য থাকে বেশি। সেই প্রাধান্যের কারণে কবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও যাপিতজীবনকে কবিতায় উপজীব্য করে তোলেন। হেলাল হাফিজও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। কবি মাত্র ৩ বছর বয়সে মাতৃহীন হন। ফলে শৈশব থেকেই তাঁকে এক সুতীব্র বেদনাবোধ তাড়িত করেছে আজীবন। এ প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেন :

> যখন ৩ বছর বয়স তখন মা মারা যান। এই মাতৃহীনতার বেদনা তখন আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন বড় হয়ে উঠলাম তখন এই বেদনা আমাকে এমনভাবে গ্রাস করতে লাগলো যে, আমার পুরোটা জীবন এই একটি ঘটনায় পাল্টে গেল কিংবা এলোমেলো হয়ে গেলো...। আজকে আমি এই যে ঘরহীন ঘরে থাকি এই ঘরহীনতা কিন্তু আমার সেই শৈশব থেকে শুরু হয়েছে। তখন থেকেই আমি এলোমেলো। (হেলাল, ২০১৪: ২২৯)

এ অবস্থায় কবির বাবা খুরশেদ আলী তালুকদার দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও প্রথমবার কবির পড়া হলো না। বাবার সঙ্গে অভিমান করে বাড়ি ছাড়েন। এক বছর পর আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। এখানেই স্নাতক পড়া অবস্থায় কবির বাবা মারা যান। ফলে আরও একা হয়ে যান কবি। এমন বাস্তবতায় তিনি 'আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে' শুধু নিজেকেই দেখতে পান। মায়ের স্মৃতি তখন তাঁকে এভাবেই আঁকড়ে ধরে :

> জননীর জৈবসারে বর্ধিত বৃক্ষের নিচে
> কাঁদতাম যখন দাঁড়িয়ে

সজল শৈশবে, বড়ো সাধ হতো
আমিও কবর হয়ে যাই,
বহুদিন হলো আমি সে রকম কবর দেখি না
কবরে স্পর্ধিত সেই একই বৃক্ষ আমাকে দেখে না। (হেলাল, ২০০৩: ১৪)

জননীর সঙ্গে সন্তানের যে অকৃত্রিম ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, জননীর অনুপস্থিতি সে সম্পর্ককে আরও আকাঙ্ক্ষিত করে তোলে। সে আকাঙ্ক্ষা নিয়েই কবির কেটেছে মাতৃহীন এক নিঃসঙ্গ শৈশব। ফলে মাতৃস্নেহের জন্য আজীবন আকাঙ্ক্ষিত এই পুত্র প্রয়োজনে মায়ের সঙ্গে কবরে থাকতেও রাজি। তবে বাস্তবে তা সম্ভব না হলে কবি বেদনাকেই আপন করে নেন। অন্যদিকে এই বেদনাবোধ তাঁকে খালি হাতে ফেরায়নি। 'সংগোপনে যোগ্য' করে তুলেছে কবিকে। আর কবিও সেই বোধকে সংগোপনে সাজিয়ে রাখেন 'সেফ্‌টি-ম্যাচের মতো বুকে'। কবির দুঃখগুলো তখন হয়ে ওঠে একেকটি 'দেশলাই-কাঠি'। সেই কাঠিতে শুধু ব্যক্তিগত 'দুঃখবারুদ'ই জমা হয় না–অন্যের দুঃখ শুষে নেবারও ক্ষমতা অর্জন করে :

আমার যতো শুভ্রতা সব দেবো
আমি নিপুণ ব্লটিং পেপার
সব কালিমা, সকল ব্যথা ক্ষত শুষেই নেবো। (হেলাল, ২০০৩: ২৯)

এভাবেই কবি তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখবোধ থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের দুঃখবোধে কাতর হওয়ার চেষ্টা করেছেন। অনুভব করার চেষ্টা করেছেন মানুষের সেই গভীর ক্ষতগুলো। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মিশতে এসে কবি দেখতে পেলেন আরেক বাস্তবতা :

মানুষের কাছে এসে
নতুন মুদ্রায় আমি নির্জন হলাম,
মিলনের নামে যেন আলাদা হলাম,
একাই ছিলাম আমি পুনরায় একলা হলাম। (হেলাল, ২০০৩: ৩০)

কবি ব্যক্তিজীবনে দুঃখের অভিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। সে কারণেই মানুষের জনারণ্যে মিশতে চাইলেন কিছুটা স্বস্তি পাওয়ার জন্য কিন্তু নতুন মুদ্রারূপী নতুন বাস্তবতায় সেই স্বস্তি পেলেন না। নিঃসঙ্গতা তাঁকে পুনরায় গ্রাস করে নেয়। শামুকের উপমায় নিজের ভেতরেই গুটিয়ে থাকেন। তখন জীবনানন্দীয় বোধে 'জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা' বলার মতো বিচ্ছিন্নতাবোধ ভর করে তাঁর কবিসত্তায়। কেননা, 'সভ্যতার অভিশাপজীর্ণ ও সমাজের অভ্যন্তরে স্বশাসিত আধুনিক মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-অভিশঙ্কা-চিত্তবৈকল্য এবং বহিশ্চাপ-অন্তশ্চাপই ব্যষ্টিবেদনে সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতাবোধ।'(বিশ্বজিৎ, ২০১৬ : ১৩) এই বোধ থেকেই কবি জেনে যান :

আমি তো গিয়েছি জেনে প্রণয়ের দারুণ আকালে
নীল নীল বনভূমি ভেতরে জন্মালে
কেউ কেউ চলে যায়, চলে যেতে হয়,
অবলীলাক্রমে কেউ বেছে নেয় পৃথক প্লাবন,
কেউ কেউ এইভাবে চলে যায় বুকে নিয়ে ব্যাকুল আগুন। (হেলাল, ২০০৩: ৩১)

বনভূমি-তো সবুজ হওয়ার কথা কিন্তু কবিতাটিতে সে বনভূমির রং নীল। আর নীল সাধারণত বেদনার রং। ফলে বোঝা যায়, এ বনভূমি নয়–বনভূমির রূপকে কবির মনোভূমির কথাই এখানে বর্ণিত হয়েছে। ব্যক্তিগত ও বহির্জীবনে যখন বেদনার জন্ম নেয় তখনই বিচ্ছিন্নতা এসে ব্যক্তিমানুষকে গ্রাস করে। ফলে সৃষ্টি হয় পৃথক প্লাবনরূপী পৃথক জগতের। স্তবকটির শেষ চরণে বক্তব্যটি আরও বেশি দৃঢ় হয় যখন শুধু বিচ্ছিন্ন বা আলাদা হওয়া নয়, একেবারে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু হৃদয়ে জমা থাকে 'ব্যাকুল আগুন'। তবে এই 'আগুনের সোনালি সন্ত্রাস'-এর চেয়ে মানুষের পোড়ানো আরও বেশি বিপজ্জনক। কারণ 'মানুষে পোড়ালে আর কিছুই রাখে না/কিছু থাকে না।' আর মানুষের আগুনেই পুড়েছে কবির হৃদয়। ফলে হেলাল হাফিজকে এ অবস্থায় হতে হয় কষ্টের 'ফেরীঅলা'। কবিতার ভেতর তখন জন্ম নেয় এক 'কষ্টদোকান'। সেখানে লাল, নীল, হলুদ এমনই নানা ধরনের কষ্টের পসরা সাজানো। কষ্টগুলোর আগে রঙের নাম দিয়ে তিনি যে বিশেষায়িত করেছেন সেখানে প্রতিটি রং একেকটি বাস্তবতার প্রতীক হয়ে আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পাথর চাপা সবুজ ঘাসের সাদা কষ্ট' এই চরণটিকে নেয়া যেতে পারে। সবুজ ঘাসের ওপর পাথর চাপা দিলে সেখানকার ঘাস মৃতপ্রায় সাদা বা ফ্যাকাসে আকার ধারণ করে। পাথর চাপা দিয়ে ঘাসগুলোর বেড়ে ওঠার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক এমনইভাবে ব্যক্তিকে তার জীবনের শুরুতেই বিকশিত হবার পথ না দিয়ে সে পথ রুদ্ধ করে দিলে সেই ব্যক্তির অবস্থা সবুজ ঘাসের সাদা হওয়ার মতোই মৃতপ্রায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে ধীরে ধীরে চারদিক থেকে বিকশিত হওয়ার পথগুলো বন্ধ হলে ব্যক্তিমানুষটি হয়ে ওঠেন প্রচণ্ড অভিমানী। এই আত্মাভিমান থেকেই তখন কবিকে বলতে হয়, 'একটি মানুষ খুব নীরবে নষ্ট হবার কষ্ট আছে।' অভিমানটিও কার্যকারণ সূত্রে গাঁথা। কারণ :

> নষ্ট রাখীর কষ্ট নিয়ে অতোটা পথ একলা এলাম
> পেছন থেকে কেউ বলেনি করুণ পথিক
> দুপুর রোদে গাছের নিচে একটু বসে জিরিয়ে নিও,
> কেউ বলেনি ভালো থেকো সুখেই থেকো
> যুগল চোখে জলের ভাষায় আসার সময় কেউ বলেনি
> মাথার কসম আবার এসো। (হেলাল, ২০০৩: ৪৬)

এই অভিমানের আড়ালে জন্মস্থানের প্রতি কবি অনুভব করেন এক প্রগাঢ় মমতা। সেই মমতা থেকেই নিজের জন্মস্থান নেত্রকোণাকে কবি সম্বোধন করেন 'বোন' বলে। ষাটের আরেক কবি রফিক আজাদ (১৯৪১-২০১৬) এই নেত্রকোণার বিরিশিরিতে বসে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই ভেবে যে, আসলে 'মানুষের নেই কোনো প্রকৃত ঠিকানা'। তবুও তিনি প্রশ্ন করেছিলেন 'আমার শিকড়ে আমি / ফিরতে পারবো না কেন?/ আমি চাই শিকড়ের খোঁজ, / নিরন্তর অন্বেষণ শিকড় সন্ধান–।' (রফিক, ২০১৬ : ৪২৪) সেই সন্ধানেই জন্মস্থানকে এমন পরম আত্মীয় ভাবা। কিন্তু সেই জন্মস্থানের সঙ্গেই হেলাল হাফিজের দীর্ঘকাল দেখা নেই। বর্তমানের যাপিত জীবনেও একা। রফিক আজাদ প্রশ্ন করেও যেতে পেরেছিলেন 'গারো পাহাড়ের পাদদেশে বিরিশিরি গ্রামে' কিন্তু হেলাল হাফিজের জন্মস্থান হওয়ার পরেও প্রায় যাওয়াই হয় না। অথচ :

হয় তো কেটেছে তার মায়া ও মমতাহীন সজল শৈশব
অথবা গিয়েছে দিন
এলোমেলো পরিচর্যাহীন এক রঙিন কৈশোর,
নাকি সে আমার মতো খুব ভালোবেসে
পুড়েছে কপাল তার আকালের এই বাংলাদেশে। (হেলাল, ২০০৩ : ৫৯)

কবির এই 'কপাল পুড়েছে' শৈশবেই। শৈশবে মায়ের মৃত্যু তাঁকে যেমন অসহায় করে তুলেছিল তেমনি পিতার দ্বিতীয় বিয়ে সেই অসহায়ত্বের সঙ্গে যোগ করে অভিমান। ফলে 'রেটিনার লোনাজলে সাঁতার'(হেলাল, ২০২০: ৪১) কাটতে কাটতে তিনি বড় হন এবং পিতার কাছ থেকে পাওয়া এটিই তাঁর 'মহান উত্তরাধিকার'। পরবর্তী জীবনে বৈষয়িক বা সাংসারিকভাবে তাঁর আর কিছু হলো না। এই 'না হওয়া' থেকে কবির অনুশোচনা নেই–তবে কিছু আক্ষেপ আছে। আর আছে সকলের জন্য শুভ প্রত্যাশা :

হলো না। না হোক,
আমি কী এমন লোক!
আমার হলো না তাতে কি হয়েছে?
তোমাদের হোক। (হেলাল, ২০১৩ : ১৩০)

স্তবকটির তৃতীয় চরণের 'কি' কবিতার ভাব অনুযায়ী হওয়ার কথা 'কী'। কারণ চরণটিতে 'কি' ব্যবহৃত হয়েছে 'মন্দ' বা 'ক্ষতি'জাতীয় বিশেষণ পদের যোজক পদরূপে। যাই হোক, ব্যক্তিজীবনের বেদনা, বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতার নেতিবাচকতা থেকে তিনি ক্রমেই ইতিবাচক জীবনভাবনায় ফিরে আসেন। ভালোবাসা পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় বলতে পারেন, 'কেউ ডাকেনি তবু এলাম, বলতে এলাম ভালোবাসি।' ভালোবাসার প্রতি বিশ্বস্ত কবি শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রতি আস্থা রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) যেমন আস্থা রেখেছিলেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০০ : ১১০২) এই বলে। রবীন্দ্রনাথের এই আপ্তবাক্যকে স্মরণে রেখে তিনি আশাবাদী হয়ে ওঠেন এভাবে :

ভালোবাসাবাসিহীন এই দিন সব নয়–শেষ নয়
আরো দিন আছে,
ততো বেশি দূরে নয়
বারান্দার মতো ঠিক দরোজার কাছে। (হেলাল, ২০০৩ : ৪৮)

২.

প্রেম বিশ্ব-কাব্যসাহিত্যের একটি অন্যতম মৌলিক বিষয়। প্রচীন যুগ, মধ্যযুগ এমনকি বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রেমে আধ্যাত্মিক প্রাধান্য ছিল। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় বিশেষত ত্রিশের কবিতা (১৩৩০ ব.) থেকে প্রেম আধ্যাত্মিক থেকে মানসিক এমনকি শারীরিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এই প্রেম বাংলাদেশের কবিতাকেও উজ্জ্বল করে তুলেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ-কবিচৈতন্যে নারীর শরীর ও মন সে প্রেমের আবাসভূমি। সেখানে প্রেমের লক্ষ্য নারী। সেই লক্ষ্য পূরণে কবিরা কখনো সরাসরি 'শরীরী উপভাষা' ব্যবহার করেছেন, কখনো নদী-নিসর্গকে ব্যবহার করেছেন উপমার আবরণে। বস্তুত :

ভালোবাসার কবিতায় আমাদের কবিদের স্বাভাবিক স্ফূর্তি লক্ষণীয়। 'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি–এমন দীর্ঘ নামের কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন পঞ্চাশের কবি ওমর আলী। আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন'-ও শ্যামঙ্গিনী বঙ্গনারীর স্তুতিতে মুখর। নারীর প্রায় সর্বত্রই রক্ত মাংসে গড়া রূপ–বাংলাদেশের কবিতায় নারী প্রতীকী অর্থে আসেনি খুব বেশি, জীবনদায়িনী কিংবা প্রেরণাদাত্রী 'আবিসিনীয় কুমারী' রূপেও নয়। শামসুর রাহমানের নারী গার্হস্থ্য, কখনও রিরংসাতপ্ত প্রেমের আধার। আল মাহমুদের প্রথম পর্বে নারী হয়ে উঠেছিল প্রতীকী ব্যঞ্জনাময়, যে ত্রিকালের কলস-কাঁখে ঘাটের পৈঠায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে 'পার হয়ে অন্ধকার বিল না জানি কোথায় যাবে এই বৃদ্ধ পথিক পুরুষ।' আহসান হাবীবের প্রেমের কবিতায় নারী কোনো বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত নয়। আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং ষাটের অন্যান্য কবিদের [কবির] লিবিডোগ্রস্ততা নারীকে মহিমান্বিত হতে দেয়নি। সে কেবলি কামসহচরী তথা শরীরী প্রেমের অনুষঙ্গ। নির্মলেন্দু গুণের নারীগ্রস্ততা প্রবাদপ্রতিম; তিনি 'চালের আড়তকেও নারীর নগ্নতা' বলে ভুল করেন; 'স্তনাগ্র চূড়ায় স্থির' তাঁর পৃথিবী। (আশরাফ, ১৯৯৪ : ১৩)

চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের দশকের এই ধারাবাহিকতায় হেলাল হাফিজের কবিতায় নারী ও প্রেমের উপস্থিতি। হেলাল হাফিজের কাব্যগুলোয় সেই নারী-প্রেমের কবিতাই বেশি। স্বয়ং কবি হেলাল হাফিজের কাছে 'অক্সিজেন,শস্যদানা, তারপরই প্রেম, তারপর কবিতা। প্রেম মানেই কিন্তু নারী। পুরুষের প্রেম নয়।' (হেলাল, ২০১৪ : ২৪৫) ফলে কবির কাছে প্রেম ও নারী অভিন্ন। তবে সেই প্রেমে বিরহের শোকগাথাই বেশি। "নিরাশ্রয় পাঁচটি আঙুল" কবিতায় তিনি হাতের পাঁচটি আঙুলকে 'নিরাশ্রয়' বলেছেন। অর্থাৎ একধরনের অসহায়তা প্রকাশ পায়। কবি কাঙ্ক্ষিত নারীকে সেই আঙুলগুলোকে অলংকার করে নিতে আহবান করেন। তারপর বলেছেন একটি বেহালা নিজেকে বাজাতে এসে সেই আঙুলে নিজের চেয়েও বিষাদের বেশি বিস্তৃতি দেখে ফিরে যায়। অসহায় একটি অঙ্গুরিও এসেছিল। কিন্তু সেও চলে গেছে। কবি তখন বলেন : 'ওরা যাক, ওরা তো যাবেই/ ওদের আর দুঃখ কতোটুকু? ওরা কি মানুষ?' কিন্তু 'ওরা' প্রত্যেকেই 'মানুষ'। 'আঙুল' 'বেহালা' 'অঙ্গুরী' এগুলো একেকটি প্রতীক। 'আঙুল' কবির ব্যক্তিপুরুষের প্রতীক আর 'বেহালা', 'অঙ্গুরী' একেকজন নারীর প্রতীক–যাঁরা কবির জীবনে এসেছিলেন ক্ষণিকের জন্য। কবি তাঁদের কাউকেই চিরস্থায়ী পাননি। এইসব নারীর মধ্যে এ কবিতায় কবি একমাত্র 'হেলেন' নামটি উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে কবিতায় ব্যক্তিনাম ব্যবহারের ঐতিহ্য হেলাল হাফিজও অনুসরণ করেন। তবে পরিচয়টি উল্লেখের দাবি রাখে। কবি নিজেই হেলেনের পরিচয় দেন এভাবে, '... হেলেন ছিল আমার সমবয়সী। আমি তার প্রেমে পড়েছিলাম। হেলেন কিন্তু আহামরি কোন সুন্দরী ছিল না, সুন্দরী ছিলেন হেলেনের মা। তাকে [তাঁকে] দেখে আমার ভেতরে মনে হতো আহা উনি যেন আমারই মা! মানুষ আসলে বিচিত্র–আমি সেই বৈচিত্র্যময়দেরই একজন।' (হেলাল, ২০১৪ : ২৩১) সেই হেলেন বোঝেননি কিন্তু কবির ইচ্ছেটিও অপ্রকাশিত থাকেনি :

ইচ্ছে ছিলো নদীর বক্ষ থেকে জলে জলে শব্দ তুলে
রাখবো তোমার দুই লাজুক চঞ্চুতে,
জন্মাবধি আমার শীতল চোখ
তাপ নেবে তোমার দু'চোখে। (হেলাল, ২০০৩ : ১৫)

এই 'নদীর বক্ষ' তো কবিহৃদয়। সেখানে জমে আছে 'দুঃখজল'। সেই দুঃখের জন্যই জন্মাবধি কবি শীতল। ফলে সেই শীতলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় কবি আর কারো চোখ খুঁজছেন। তবে এ কবিতায় কবি যাঁর দুচোখে তাপ নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি হেলেন নন, তিনি কবির ফুপাতো বোন মেহেরুন্নেছা রেণু–যাঁকে কবি রেণু আপা বলে ডাকতেন। (হেলাল, ২০১৪ : ২৩২) যিনি কবির চেয়ে ১০-১২ বছরের বড় এবং যাঁর 'অমিত লাবণ্য' কবিকে 'কল্পনায় অনুপ্রাণিত' করত। কিন্তু সেই রেণু আপাও আজ 'অন্য ঘরে'। এই 'কিশোর কল্পনা'য় রেণু আপার স্মৃতি যেমন উজ্জ্বল হয়ে আছে তেমনি সদ্যযৌবনে শারীরিক উষ্ণতার বাঙ্ময় প্রতিচ্ছবিও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতায়। সেই উষ্ণতার অনুভূতিটি এমন :

> তোমার বুকে বুক রেখেছি বলেই আমি পবিত্র আজ
> তোমার জলে স্নান করেছি বলেই আমি বিশুদ্ধ আজ
> যৌবনে এই তৃষ্ণা কাতর লকলকে জিভ
> এক নিশীথে কুসুম গরম তোমার মুখে
> কিছু সময় ছিলো বলেই সভ্য হলো
> মোহান্ধ মন এবং জীবন মুক্তি পেলো। (হেলাল, ২০০৩ : ২০)

স্তবকটিতে এক নারী ও এক পুরুষের শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। তবে এ ঘনিষ্ঠতা প্রাত্যহিক নয়–কোনো এক বিশেষ সময়ে ক্ষণিকের জন্য। তবে স্তবকটির উপস্থাপনার গুণে এ ঘনিষ্ঠতা শুধু জৈবিক তৃপ্তি নয়–জৈবিকতা থেকে মুক্তির আস্বাদ হয়ে উঠেছে। কেননা, সেই নারীর বুকে বুক রেখে সেই পুরুষ পবিত্র হয়েছেন আর তাঁর 'শরীরজলে' স্নান করে হয়েছেন বিশুদ্ধ। অর্থাৎ মিলনের চরম আকাঙ্ক্ষায় পুরুষহৃদয়টি এতদিন বিচলিত ছিল, আজ বিশুদ্ধ হয়েছে। ক্ষণিক-মিলনে শান্তি পেয়েছেন এক দীর্ঘ-ক্লান্ত পথিকপুরুষ। অন্যদিকে এ আকাঙ্ক্ষা শুধু সেই পুরুষের নয়–সেই নারীরও। কেননা, সেই নারীরও মুখ ছিল 'কুসুম গরম'। সেখানেই কিছু সময়ের জন্য ছিল সেই পুরুষের 'তৃষ্ণাকাতর লকলকে জিভ'। ঘনিষ্ঠতার এমন চরম মুহূর্তে 'মোহান্ধ মন এবং জীবন' মুক্তি পেয়েছে। উষ্ণতার এ অভিজ্ঞতা পুরুষটির কাছে প্রথম। কারণ, সেই নারীর কাছে পুরুষটি তেমনি ঋণী, তাঁর বাবা ও মায়ের কাছে যেমন ঋণী । প্রকৃতপক্ষে বাবা-মায়ের কাছে সন্তান প্রথম ঋণী হন। এ পর্যন্ত কবিতাটি আকাঙ্ক্ষিত অথচ অনভিজ্ঞ দুই যুবক-যুবতীর ঘনিষ্ঠতার চিরন্তন অনুভূতির বর্ণনাময় প্রকাশ ছিল। কিন্তু কবিতাটির শুরুতেই কবি সেই নারীর নাম হিরণবালা দিয়ে তাঁকে নৈর্ব্যক্তিক থেকে ব্যক্তিক করে তোলেন। নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫) যেমন কারো নাম দিলেন না, তবু বললেন :

> তাড়া দিও না, নাড়া দিও না।
> চুপ ক'রে থাকো মেয়ে।
> ... ... ...
> মনে করো তুমি লতা,
> উঠছো চীনের দীর্ঘ-প্রাচীর বেয়ে।
> কাজের সময় কোনো কথা নয়।
> চুপ ক'রে থাকো মেয়ে। (নির্মলেন্দু, ২০১১ : ৩৯৩)

এখানে ঘনিষ্ঠতায় শারীরিক তৃপ্তির কথা আছে কিন্তু হেলাল হাফিজের 'হিরণবালা'র মতো মুক্তির আনন্দ নেই। তবে নির্মলেন্দু গুণ কারো নাম না নিয়ে এমন ঘনিষ্ঠতাকেও নৈর্ব্যক্তিক করে তোলেন। হেলাল হাফিজ বিশ্বাস করেন 'ভালোবাসা মিলনে মলিন হয়, বিরহে উজ্জ্বল' অথচ :

নারী তুমি শৈল্পিক তাবিজ,
এতোদিন নারী ও রমণীহীন ছিলাম বলেই ছিলো
দুঃখের আরেক নাম হেলাল হাফিজ। (হেলাল, ২০০৩ : ২১)

ভালোবাসা বিরহে উজ্জ্বল হলে মিলনের জন্য এত উদগ্রীব কেন কবি? তাহলে কি প্রেম ও নারীকে কবি আলাদা করে দেখছেন। কিন্তু নারী ও প্রেম অভিন্ন বলে অনেক আগেই কবি আমাদের জানিয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে নারী ব্যক্তিপুরুষকে হয়তো স্বস্তি দেয় কিন্তু রমণীহীনতা থেকে যে দুঃখের উৎপত্তি তা থেকেই হেলাল হাফিজ সৃষ্টি করেন কবিতার পরশ পাথর। যার স্পর্শে জেগে ওঠে মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেমানুভূতি। হেলাল হাফিজের প্রেম শুধু নিজের ব্যক্তিগত বেদনা ভুলে থাকার জন্য নয়। প্রেম তিনি শুধু একপাক্ষিক নিতে চাননি, দিতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু কবির বিশাল হৃদয় থেকে সেই প্রেম কতটুকুই বা নিতে পেরেছেন নারীরা। এজন্যই কবির অভিমত এমনই :

কতটুকু দিলে বলো মনে হবে দিয়েছি তোমায়,
আপাতত তাই নাও যতটুকু তোমাকে মানায়। (হেলাল, ২০০৩ : ৩৩)

শুধু তাই নয়, ভাদ্রের এক বর্ধিত আষাঢ়ে এক নারীর সঙ্গে কবির দেখা হয়েছিল একবারের জন্যই। তারপর আর দেখা হয়নি। সেই এক দেখাতেই প্রেম। তারপর দিন-রাত, বছর-মাস, পথে প্রান্তরে সেই নারীকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কবি সেই আষাঢ়কে বলেছেন 'চতুর আষাঢ়'। সেই নারীর নামে কবি সব কিছু করেছেন তারপরও তাঁর মন না ভরলে 'এই নে হারামজাদী' বলে পুরো জীবনটাই তাঁকে দিয়ে দিলেন। যদিও তা 'ভুল রমণীর ভালবাসা' তবুও সেই প্রেমের প্রতিই কবি নিজেকে সমর্পণ করেন। প্রতীক্ষা করেন সেই সব নারীর–যাঁদের কবি ভালোবেসেছিলেন :

একবার আমন্ত্রণ পেলে
সব কিছু ফেলে
তোমার উদ্দেশে দেবো উজাড় উড়াল,
অভয়ারণ্য হবে কথা দিলে
লোকালয়ে থাকবো না আর
আমরণ পাখি হয়ে যাবো,–খাবো মৌনতা তোমার। (হেলাল, ২০০৩ : ৫৩)

পুরুষপ্রেম দিয়ে নারীর সমস্ত নীরবতাকে গ্রাস করার মতো এমন আত্মবিশ্বাস বিরল। লোকালয় ছেড়ে কবি তাঁর কাঙ্ক্ষিত নারীকে নিয়ে চলে যাবেন অভয়ারণ্যে। সেখানে তিনি পাখি হবেন। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) উক্ত 'যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের' সেই জীবনের সঙ্গে দেখা করবেন। এতসব আয়োজনের পরও যদি সেই নারী 'কথা' না দেন, তাহলে :

আর না হলে যত্ন করে ভুলেই যেয়ো, আপত্তি নেই।
গিয়ে থাকলে আমার গেছে, কার কী তাতে?
আমি না হয় ভালোবেসেই ভুল করেছি ভুল করেছি,

নষ্ট ফুলের পরাগ মেখে
পাঁচ দুপুরে নির্জনতা খুন করেছি, কী আসে যায়? (হেলাল, ২০০৩ : ৬২)

‘কী আসে যায়’ কবি বলছেন, তবে কবির অনেক কিছুই এসে যায়। এ কারণে ‘কবিতা একাত্তর’ কাব্যে তিনি বলে ওঠেন ‘যদি যেতে চাও, যাও/ আমি পথ হবো চরণের তলে’ আর ‘না ছুঁয়ে তোমাকে ছোঁব’ এমন আত্মাভিযান। হেলাল হাফিজের এই অভিযান আক্ষেপে ভরা। এই আক্ষেপ থেকেই ‘বেদনাকে বলেছি কেঁদো না’ কাব্যে তিনি ‘ব্রহ্মপুত্রের মেয়ে’কে অভিশাপ দেন, ‘তুমি সুখী হবে’। কবি শৈশব থেকেই তাঁর জীবনে নারীর এভাবেই চলে যাওয়া দেখেছেন। মাকে দিয়ে শুরু। এরপর হেলেন, হিরণবালা, সবিতা, রুণা আপা, নিউইয়র্কের নার্গিস এমনই কতজন! তাঁরা প্রত্যেকেই কবির জীবনে এসেছিলেন নারীর কোনো না কোনো রূপ নিয়ে। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)র কবিতার ‘ছেলেবেলার বোস্টুমি’ ‘মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি’, ‘কাঁধ ছুঁয়ে আশ্বস্ত করা ‘বাবা’ কিংবা ‘বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমালরাখা বরুণা’ তাঁরাও প্রত্যেকে কথা দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা কথা রাখেননি কিংবা রাখতে পারেননি। ভালোবাসার জন্য সুনীল ‘হাতের মুঠোয় প্রাণ’ নিয়ে ‘দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে লাল কাপড়’ বাঁধলেও বরুণার বুক থেকে শুধু ‘মাংসের গন্ধ’ পেয়েছিলেন। (সুনীল, ২০০৬ : ৩৫-৩৬) হেলাল হাফিজের কবিতায় উল্লিখিত নারীরাও কথা রাখেননি কিংবা রাখতে পারেননি। ফলে হেলাল হাফিজকে ভোগ করতে হয়েছে নির্জনতা আর নিঃসঙ্গতা। সেই নিঃসঙ্গতার ভেতর থেকেই তিনি সৃষ্টি করে যান প্রেমের অমর পঙ্‌ক্তিমালা।

৩.

ষাটের প্রায় সব কবির মধ্যেই একটা দ্রোহবোধ কাজ করেছিল। তবে এই দ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে কখনো সরাসরি, কখনো পরোক্ষতার আবরণে। এর কারণটিও স্পষ্ট। সামরিক শাসনে স্বৈরাচারী নীতিতে শিল্পীর স্বাধীনতা থাকে না। এ জন্য :

> শিল্পীর স্বাধীনতার জন্য গণতন্ত্র একটি পূর্বশর্ত, ১৯৫৮-৬৮কালপর্বে সামরিক একনায়কতন্ত্রের প্রচণ্ডতা সেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে সর্বাংশে নিঃশেষ করার জন্য নির্মাণ করেছিল এক কালো অবরুদ্ধতার দেয়াল। ১৯৬৯-এ সেই আগ্রাসী একনায়কতন্ত্রের প্রাসাদই কেবল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল না, নব্য-উপনিবেশিকদের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রজাল উন্মোচিত হল বাঙ্গালির জাতীয় চৈতন্যে। (রফিকউল্লাহ, ২০০৭ : ৬৯)

এই চৈতন্যেই হেলাল হাফিজ তাঁর কবিসত্তার উন্মোচন করেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ‘ছয় দফা’ উত্থাপন করলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর টনক নড়ে। এই ‘ছয় দফা’কে বানচাল করে বাঙালির স্বাধিকার-চেতনাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ১৯৬৭ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলার কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি এবং ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে সাজানো মামলায় জড়ানো হয় :

> প্রকৃতপক্ষে এই মামলা আইয়ুবের জন্য আত্মঘাতী হয় এবং এ তাঁর পতন ত্বরান্বিত করে। শেখ মুজিবকে এই মিথ্যা মামলায় জড়ানোর জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের মনে দারুণ ক্ষোভ ও অসন্তোষের আগুন জ্বলে ওঠে। ছাত্ররা শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। সরকার এই আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশ ই.পি.আর. আর সামরিক বাহিনীকে মোতায়েন করে। ১৯৬৮ সনের শেষের দিকে

এবং ১৯৬৯ সনের প্রথম ভাগে এই আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্রতর হয় এবং শেষ পর্যন্ত গণ-অভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করে। (আবদুর রহিম ও অন্যান্য, ২০০৬ : ৪৭৭)

এরকম সময় হেলাল হাফিজ হাজির হলেন তাঁর "নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়" নিয়ে :

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়। (হেলাল, ২০০৩ : ৯)

কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই চরণদুটি বাতাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাংলায়। আন্দোলনরত ছাত্র-যুবকদের রক্তে আগুন লাগানোর মতো চরণদুটি হয়ে উঠল তাঁদের অগ্নিস্বর। তারপর যখন কবি বললেন :

কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয়।
যদি কেউ ভালোবেসে খুনী হতে চান
তাই হয়ে যান
উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায়। (হেলাল, ২০০৩ : ৯)

তখন যাঁরা মধ্যবিত্তদ্বিধায় তাড়িত ছিলেন তাঁরাও অনুপ্রাণিত হলেন। কারণ দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কিছু করার এই সুযোগ সবসময় পাওয়া যাবে না। আর কবিতায় উদ্ধৃত প্রেমতো দেশপ্রেম, প্রেমিকতো দেশপ্রেমিক আর দেশকে ও দেশের মানুষকে বাঁচানোর জন্য যদি আইয়ুব খানের সামরিক শক্তিকে হত্যা করতে হয় তবুও তা করতে হবে। এমন খুনের পরিবর্তে বাঁচবে কোটি কোটি বাঙালি। চল্লিশের দশকে সুকান্ত ভট্টাচার্য যেমন বলেছিলেন :

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি। (সুকান্ত, ২০১০ : ৬২)

যৌবনের এই দুঃসাহসকে ষাটের দশকে এসে হেলাল হাফিজ আরেকবার 'অগ্নি-উৎসাহে' আমন্ত্রণ জানালেন। কবিতাটি লেখার প্রাক্-মুহূর্ত সম্পর্কে কবি বলেন :

> ৬৮-এর শেষ দিককার ঘটনা। একদিন নবাবপুর থেকে রিক্সায় ছড়ে [চড়ে] গুলিস্তান হয়ে হয়ে [হয়ে] ফিরছিলাম। রিক্সাঅলার সঙ্গে রাজনৈতিক বাধাবার্তার [কথাবার্তার] এক পর্যায়ে রিক্সাঅলা বললো, 'কোন কোন ভালোবাসা আছে খুন করাও জায়েজ।'–৬৯-এর অভ্যুত্থানের ঘটনাবলি এবং রিক্সাঅলার এই উক্তিটি মিলেমিশে আমাকে 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়'-র মেসেজ কি [কী] হবে, তা স্থির করে দেয়। কবিতাটির চূড়ান্ত রূপ পায় ফেব্রুয়ারি '৬৯-এ। (হেলাল হাফিজ, ২০১৪ : ১৬৭)

আর কবিতাটি প্রকাশ পাবার পর কবির অনুভূতিটা এমন :

> ঢাকার একটি লিটন [লিটল] ম্যাগাজিনে কবিতাটি ছাপা হয়। আহমদ ছফা ও কবি হুমায়ুন কবির দু'জনে মিলে তাদের [তাঁদের] সাগরেদদের দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে কবিতাটির দুটি লাইন শ্লোগান আকারে 'চিকা' মারান। সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঢাকা শহরের নানা জায়গায় একই শ্লোগান 'এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তা [তার] শ্রেষ্ঠ সময়, এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।' তখনই বুঝলাম কবিতার কী শক্তি। (হেলাল হাফিজ, ২০১৪ : ২২০-২২১)

কবিতাটির দুই ধরনের শক্তি রয়েছে। প্রথমত অন্তর্শক্তি। সে অন্তর্শক্তি বোঝা যায় কবির ভাব-চেতনায়। চেতনায় ছিল বাঙালির স্বাধিকারবোধ আর সেই বোধের ব্যাপ্তি ঘটল তাঁর

ভাবনায়। সে ভাবনায় তিনি সংসারী, সংসার-বিরাগী, শাশ্বত শান্তিবাদী কাউকেই বাদ দেননি। জাতির এ দুর্যোগে তিনি কয়েকটিমাত্র চরণে সকলকে এক জায়গায় এনেছেন–উজ্জীবিত করেছেন। দ্বিতীয়ত বহির্শক্তি। এই শক্তিটি প্রকাশ পেয়েছে কবিতাটির শব্দসজ্জায়। শব্দকে তত্ত্বের প্রচারে তৎসম শব্দের প্রয়োগে ভারবাহী করে তুললেন না আবার একেবারে নৈমিত্তিক (Casual) শব্দ ব্যবহারে কবিতাকে নিম্নস্বরগ্রামেও নিয়ে যাননি। একটি তরুণ, শিক্ষিত, সচেতন শ্রেণিকে জাগিয়ে তোলার জন্য তাদের উপযোগী শব্দই ব্যবহার করেছেন। ফলে ভাবচেতনার সঙ্গে শব্দের অপূর্ব মেলবন্ধনে কবিতাটি মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে আবার যখন তিনি বলেন :

মানব জন্মের নামে হবে কলঙ্ক হবে
এ রকম দুঃসময়ে আমি যদি মিছিলে না যাই,
উত্তর পুরুষে ভীরু কাপুরুষের উপমা হবো
আমার যৌবন দিয়ে এমন দুর্দিনে আজ
শুধু যদি নারীকে সাজাই। (হেলাল, ২০০৩ : ১১)

১৯৬৯ সালে বাঙালির গণঅভ্যুত্থান সফলভাবে শেষ হয়েছে। আইয়ুব খানের পতন হয়েছে। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনও শেষ হয়েছে। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে নানা টালবাহানার আশ্রয় নেয়। কবি বুঝতে পারছেন বাঙালির সামনে আরও দুর্দিন আসছে–আরো বড় একটি যুদ্ধ হয়তো অপেক্ষা করছে। সে কারণে এমন দুর্দিনে যারা বিপ্লবী নন, শুধুমাত্র প্রেমিক তাঁদের ব্যক্তিগত প্রেম ছেড়ে দেশপ্রেমে সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করেন। "দুঃসময়ে আমার যৌবন" নামে এই কবিতাটি কবি লিখছেন ১৯৭১ সালে ১৪ই ফেব্রুয়ারি–ভ্যালেনটাইন ডে বা বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে। এইদিন কবি নারীকে সাজানো ছেড়ে, ব্যক্তিগত ভালোবাসা-ভুলে বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের মিছিলে শামিল হতে আহবান জানান। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'পদাতিক' কাব্যে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) এমনই আহবান জানিয়েছিলেন মে-ডে তে। ইংল্যান্ডে মে মাসের এক তারিখে বসন্তবরণে ফুলের উৎসব হয়। সেই ফুল-উৎসব পালন করতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিষেধ করেছিলেন। কারণ :

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া। (সুভাষ, ২০১৪ : ১/২২)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও হেলাল হাফিজ দুজন কবির কবিতাদুটিতে বক্তব্য ও বাস্তবতা প্রায় একই তবে প্রেক্ষাপট আলাদা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'ফুল খেলতে' নিষেধ করেছেন মার্কসবাদী চেতনা থেকে আর 'বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে' হেলাল হাফিজ শুধু নারীকে সাজাতে নিষেধ করেছেন বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে। সেই চেতনা থেকেই হেলাল হাফিজ অনুভব করেছেন ১৯৭১ সালে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে তাঁদের যুদ্ধাস্ত্রকে প্রেমিকার মতোই বুকে আগলে

রেখেছিলেন। প্রেমিকারূপী সেই অস্ত্রকে বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ চলাকালীন 'তাঁবুর ভেতরে ঢুকে' বারবার দেখেছেন, তাঁদের বুকে সেই অস্ত্রের বুক লাগাতেই অস্ত্রটি গর্জে উঠতো আর 'মুহূর্তেই লুফে নিতো অত্যাচারী শত্রুর নিঃশ্বাস' :

অথচ তোমাকে আজ সেই আমি কারাগারে
সমর্পণ করে, ফিরে যাচ্ছি ঘরে
মানুষকে ভালোবাসা ভালোবাসি বলে। (হেলাল, ২০০৩ : ১২)

দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরেন। দেশে ফিরেই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গঠনের কাজে মনোযোগ দেন। এসময় তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র জমা দেওয়ার আহবান জানান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে "অস্ত্র সমর্পণ" কবিতাটি লেখা। কবিতাটি সম্পর্কে স্বয়ং কবি বলেন :

> আমার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যারা ফেব্রুয়ারিতে পল্টনে শেখ সাহেবের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছিল। তারা অস্ত্র সমর্পণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমার হলের রুমে উঠল। অস্ত্র সমর্পণের পর রাতে হলে ফিরে তাদের বিরামহীন কান্না শুরু হয়ে গেল। এই অস্ত্রের সঙ্গে ওদের যে অন্তরঙ্গতা, নির্ভরতা, বিশ্বস্ততা ছিল তা হারিয়ে যেন অসহায় বোধ করতে লাগল। ...এই অনুভূতিটাকেই আমি তাদের হয়ে ওই কবিতায় আনতে চেয়েছি। (হেলাল হাফিজ, ২০১৪ : ২০০)

তবে অস্ত্র সমর্পণের এমন 'অসহায়' অনুভূতিই কবি শুধু প্রকাশ করেননি, সেই সঙ্গে যদি প্রয়োজন পড়ে সেই অস্ত্র আবারও ব্যবহার করা হবে এমন সতর্কবার্তাও তিনি দেন। ১৯৭২ সালের ৩১শে জানুয়ারি অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্র সমর্পণের পর 'মুজিব বাহিনী'র অন্যতম অধিনায়ক সিরাজুল আলম খান বলেছিলেন 'যারা বিজয়ী, তারা কখনো অস্ত্র সমর্পণ করে না। প্রয়োজনে তারা অস্ত্র জমা রাখে। আমরা অস্ত্র জমা রাখলাম।' (মহিউদ্দিন, ২০১৪ : ৬৭) এই 'জমা রাখা' আর 'সমর্পণ'করা শব্দ দুটোর অর্থ এক নয়। সমর্পণের অর্থ স্বত্ব ত্যাগ করে দেওয়া আর জমা রাখার অর্থ হলো প্রয়োজনে ফেরত নেওয়া যাবে। এই প্রয়োজনটি সম্পর্কে  হেলাল হাফিজ বলেন :

যদি কোনোদিন আসে আবার দুর্দিন,
যেদিন ফুরাবে প্রেম অথবা হবে না প্রেম মানুষে মানুষে
ভেঙ্গে সেই কালো কারাগার
আবার প্রণয় হবে মারণাস্ত্র তোমার আমার। (হেলাল, ২০০৩ : ১২)

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় হেলাল হাফিজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন। কবি 'একাত্তুর [একাত্তর] এর পঁচিশে মার্চের পর বহু কষ্টে ঢাকা থেকে নেত্রকোণা পালিয়ে এসে যুদ্ধের জন্য যুব এবং ছাত্র সমাজকে একত্র করার প্রচেষ্টা চালান।' (মজিবুর, ২০১৪ : ৮৯-৯০) এ সম্পর্কে কবি বলেন 'আমি সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা নই।...তবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছি।' (হেলাল, ২০১৪ : ২০০) এই সহযোগিতা করতে গিয়েই তাঁকে ভুলে থাকতে হয়েছে স্বজন কিংবা প্রিয় মানুষটিকে। এ কারণেই সেই প্রিয় মানুষকে উদ্দেশ্য তাঁকে বলতে হয় 'জন্মভূমি সেদিন তোমার সতীন ছিলো।' কিন্তু "অস্ত্র সমর্পণ"-এর মাত্র দুবছরের মধ্যে কবিকে বলতে হচ্ছে :

এইতো আবার যুদ্ধে যাবার সময় হলো
আবার আমার যুদ্ধ খেলার সময় হলো
এবার রানা তোমায় নিয়ে আবার আমি যুদ্ধে যাবো
এবার যুদ্ধে জয়ী হলে গোলাপ বাগান তৈরি হবে। (হেলাল, ২০০৩ : ১৭)

এই কবিতাটি কবি লিখছেন ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে। দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দুই বছরের মাথায় কবিকে আবার যুদ্ধে যেতে হবে! তাহলে কি "অস্ত্র সমর্পণ" কবিতায় মারণাস্ত্রের সঙ্গে পুনর্বার প্রণয়ের কথা বলেছিলেন '৭৩-এ এসে তার কি আবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে? 'এবার যুদ্ধে জয়ী হলে গোলাপ বাগান তৈরি হবে'। তাহলে কি '৭১-এর যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পরেও কবির কাঙ্ক্ষিত 'গোলাপ বাগান' তৈরি হয়নি? এমন প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে সামনে এসে দাঁড়ায়। এমনকি দ্বিতীয়বারের এই যুদ্ধে কবি শহিদ হবেন এমন আশঙ্কাও পাওয়া যায়, যখন তিনি বলেন 'আমরা দু'জন হয় তো রানা মিশেই যাবো মাটির সাথে।' বিষয়টি ১৯৭৪-এ এসে কবি কিছুটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছেন। কবি বুঝতে পারছেন 'পাল্টে গেলো কতো কিছু,– রাজনীতি,/ সিংহাসন, সড়কের নাম, কবিতার কারুকাজ,/ কিশোরী হেলেন'। এ সময় কবি আবারও পতনের ডাক দিচ্ছেন, 'পতন দিয়েই আজ ফেরাবে পতন'। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)ও একসময় এমনই শেকল পরেই শোষণের শেকল বিকল করার কথা বলেছিলেন। ১৯৮০ সালে এসে হেলাল হাফিজ তাঁর হতাশার কারণ স্পষ্ট করলেন। এসময় এসে তিনি অনুধাবন করছেন 'যুদ্ধোত্তর মানুষের মূল্যবোধ' তুমুলভাবে পাল্টাচ্ছে আর তাঁর মনে হয়েছে 'নেতা ভুল'। এসময় কবি দেশবাসীর উদ্দেশে বলছেন :

আমার কষ্টেরা বেশ ভালোই আছেন, মোটামুটি সুখেই আছেন।
প্রিয় দেশবাসী;
আপনারা কেমন আছেন? (হেলাল, ২০০৩ : ৩২)

কষ্টেরা ভালোই আছে অর্থাৎ কবি ভালো নেই। প্রকৃতপক্ষে দেশবাসীও ভালো নেই এমনটা বুঝেই কবি এই প্রশ্ন করেছেন। আশির দশকে দেশবাসীর ভালো থাকার কথাও নয়। এসময় তো বাংলাদেশ ষাটের দশকের মতো পুনরায় সামরিক শাসকের হাতে বন্দী। তার উপরে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসীম সাহস, অসাধারণ দক্ষতা ও দূরদর্শিতা দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সেই নেতৃত্বে সাত কোটি বাঙালি মুক্তি পেয়েছিল পাকিস্তানি শোষণ আর বৈষম্য থেকে। তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্বেই স্বাধীন বাংলাদেশ কেবল পথচলা শুরু করে। এমন সময়ে তাঁকে এদেশেরই কিছু পথভ্রষ্ট ঘাতক রাতের আঁধারে নির্মমভাবে হত্যা করে। যারা বঙ্গবন্ধুকে চিনতে পারেনি তারা আসলে 'মাটি আর মানুষের প্রেমের উপমা সেই/অনুপম যুদ্ধকে...' চেনে না। কেননা :

গাভিন ক্ষেতের ঘ্রাণ, জলের কলস, কাক
পলিমাটি চেনা মানে আমাকেই চেনা।
আমাকে চেনো না?
আমি তোমাদের ডাকনাম, উজাড় যমুনা। (হেলাল, ২০০৩ : ৩৬)

কবিতাটিতে এই 'আমি' আসলে বঙ্গবন্ধু। এ সম্পর্কে কবি বলেন, 'আমি এই কবিতাটি লিখেছি বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে মনে করে। ...যিনি এবং তার [তাঁর] দেশ

পরস্পর অবিচ্ছিন্ন এক সত্তা!' (হেলাল, ২০১৪ : ২৩৫) অথচ এই 'সত্তা'কেই হত্যা করা হলো বাংলার মাটিতেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীরা বাংলাদেশকে বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল। রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, উপসনালয়, কারখানা, ব্যাংক, মানুষের ঘরবাড়ি সবকিছু তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন দিতে হলো, স্বাধীন দেশে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে পর্যন্ত হত্যা করল। হেলাল হাফিজ এজন্য দুঃখ করে বলেন, 'স্বাধীনতা সব খেলো, মানুষের দুঃখ খেলো না।' এ কারণে আশির দশকে সামরিক শাসনে চরম দুঃসময়ে কবিকে বলতে শোনা যায়, 'দুঃসময়ে আপনি কিছু বলুন/ একটা কিছু করুন।' স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা, সামরিক শাসনের সূত্রপাত ও তার দীর্ঘ ধারাবাহিকতা, রাজনৈতিক মূল্যবোধহীনতা এসবের মধ্যে কবির প্রাণ ওষ্ঠাগত। এ অবস্থাতে কবির ব্যঞ্জনাময় আর্তচীৎকার :

কে আছেন?
দয়া করে আকাশকে একটু বলেন–
সে সামান্য উপরে উঠুক,
আমি দাঁড়াতে পারছি না। (হেলাল, ২০১৩ : ১৩২)

৩.১.

দেশীয় বাস্তবতার পাশাপাশি বিশ্বসংকটও হেলাল হাফিজের কবিসত্তাকে নাড়া দিয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন রূপ বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে রূপ আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী সে আগ্রাসন বন্ধ হয়নি বরং তা ছড়িয়ে পড়েছে আরও বেশি। পুঁজিবাদী মানসিকতা থেকেই প্রভাব বিস্তারের ধারণাটি আসে। আর প্রভাব বিস্তারের প্রথম শর্তই হচ্ছে সাম্রাজ্য বিস্তার। ফলে স্নায়ুযুদ্ধকবলিত বিশ্বে :

> ৮০'র দশকের গোড়ায় অগ্রণী পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল, নয়া রক্ষণশীল, নয়া ফ্যাসিস্ট প্রবণতার বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। মেহনতিদের প্রতি মারমুখিতার পথ নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় দমনের, স্বৈরাচারী, সর্বগ্রাসী পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীলতা সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপ নিচ্ছে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলায়, অস্ত্র প্রতিযোগিতায়, সামরিক হঠকারিতায়, রকেট-পারমাণবিক যুদ্ধের খোলাখুলি আয়োজনে। (সেলেজনেভ ও অন্যান্য, ১৯৮৮ : ১৫৫)

এই 'বিপজ্জনক রূপ' আর তার 'আয়োজন'টি হেলাল হাফিজ খেয়াল করেছেন তাঁর কবিজীবনের শুরু থেকেই। 'মোহরের প্রিয় প্রলোভনে' কেউ কেউ যুদ্ধবাজ হয়ে যায় কবি তা জানেন। আর বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধবাজদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র পারমাণবিক বোমা। হেলাল হাফিজ দুটি চরণে মাত্র ছয়টি শব্দের সহযোগে সেই পারমাণবিক বোমার অমানবিক রূপটি প্রকাশ করেন :

নিউট্রন বোমা বোঝ
মানুষ বোঝ না! (হেলাল, ২০০৩ : ২৫)

বিজ্ঞানী জেমস চ্যাডউইক ১৯৩২ সালে নিউট্রন আবিষ্কার করেন। এই নিউট্রন পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের গুরুত্বপূর্ণ কণা। নিউট্রনের মাধ্যমেই নিউক্লীয় অস্ত্র তৈরি সহজ হয়ে যায়। যার ফলে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মানব সভ্যতার ধ্বংসকারী পারমাণবিক

বোমা বানানো সম্ভব হয়। ১৯৪৫ সালে যার প্রয়োগের ক্ষত আজও জাপানকে বহন করতে হয়। পৃথিবীব্যাপী এমন সাম্রাজ্যবাদী  অসুস্থ প্রতিযোগিতায় হয়তো কোনো কোনো রাষ্ট্রের ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বাড়ে কিন্তু ক্ষতি হয় মানুষের-মানবিকতার। কবিতাটিতে যুদ্ধাহত প্রতিটি মানুষের অজস্র বেদনা ও যুদ্ধের অমানবিকতাকে হেলাল হাফিজ মাত্র দুটি চরণের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। তবে বিশ্বব্যাপী এই পুঁজিবাদী আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের রোধকল্পে হেলাল হাফিজ রাজনৈতিক চেতনায় বামপন্থি। 'যে সমাজ ব্যবস্থার [ব্যবস্থায়] মানুষ তার মৌলিক মানবিক প্রয়োজন ও অধিকার পেতে পারে-আমি তেমন সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী।' (হেলাল, ২০১৪ : ১৬৭) শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে তিনি সরাসরি বলেন, 'আমি সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন দেখি।' (হেলাল, ২০১৪ : ১৬৭)  হেলাল হাফিজের এই স্বপ্ন তাঁর কবিতায় বিশ্বাস হয়ে প্রকাশ লাভ করেছে :

এই নাও বাম হাত তোমাকে দিলাম।
একটু আদর করে রেখো, চৈত্রে বোশেখে
খরা আর ঝড়ের রাত্রিতে মমতায় সেবা ও শুশ্রুষা দিয়ে
বুকে রেখো, ঢেকে রেখো, দুর্দিনে যত্ন নিও
সুখী হবে তোমার সন্তান। (হেলাল, ২০০৩ : ২৮)

প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এগিয়ে যেতে হয়। তবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে লালিত বামপন্থি দলগুলোকে সেই ঘাত-প্রতিঘাতের একটু বেশি সহ্য করতে হয়। কারণ এ দলগুলোকে বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার প্রায় প্রতিটি স্তরের সঙ্গে লড়তে হয়। একদিকে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের গ্রাস, অন্যদিকে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এমন ত্রিমুখী আক্রমণের  মধ্যে এ দলগুলোকে টিকে থাকতে হয়। আর এ কারণেই কবি দলের দুর্দিনে দলটির যত্ন নেবার কথা বলেছেন। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে প্রায় ত্রিশ লক্ষ বাঙালির জীবন আর দুই লক্ষ নারীর নির্যাতনের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা-যুদ্ধে যেসব বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের আশা ছিল স্বাধীনতা পেলে 'ভজন গায়িকা সেই সন্ন্যাসিনী' সবিতা মিস্ট্রেস ব্যর্থ চল্লিশে বসে বলবেন, 'পেয়েছি, পেয়েছি', 'পাতা কুড়োনির মেয়ে শীতের সকালে ওম নেবে জাতীয় সঙ্গীত শুনে পাতার মর্মরে','ভূমিহীন মনুমিয়া গাইবে তৃপ্তির গান','যুদ্ধের শিশু সসম্মানে বাঁচবে দুধে-ভাতে'। হেলাল হাফিজ এভাবে স্বাধীনতার স্বপ্নগুলোকে প্রতীকবদ্ধ করেছেন। সেই সঙ্গে একটি রাজনৈতিক আদর্শের কথাও বলেন :

কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
আমাদের সব দুঃখ জমা দেবো যৌথ-খামারে,
সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে সমান সুখের ভাগ
সকলেই নিয়ে যাবো নিজের সংসারে। (হেলাল, ২০০৩ : ৩৮)

'সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ' বলতে কবি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। যৌথ খামারের ধারণাটিও সমাজতান্ত্রিক। চীনে ১৯৫৫ সালে গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক যৌথ-কৃষি-খামার গড়ার আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং এই খামারের মূল নীতি  হলো 'শ্রমের পরিমাণ অনুসারে উৎপাদনের বণ্টন' (সুপ্রকাশ, ২০০০ : ৯৪)। 'কথা' অনুযায়ী বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্রীয় চার নীতি যথা বাঙালি

জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর থেকে সামরিক শাসনের বলয়ে দেশকে ক্রমেই সেইসব মূলনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হতে থাকে। ফলে কবিকে বলতে হয় :

কলিমুদ্দিনের পোলা চিডি দিয়া জানাইছে,–'ভাই
আইতাছি টাউন দেখতে একসাথে আমরা সবাই,
নগরের ধাপ্পাবাজ মানুষেরে কইও রেডি অইতে
বেদম মাইরের মুখে কতোক্ষণ পারবো দাঁড়াইতে।' (হেলাল, ২০০৩ : ৪০)

কবিতাটি মাও সেতুং এর 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও'[১]-এর বিপ্লব তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৬৭ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি আন্দোলনেও এ তত্ত্বের প্রয়োগ করা হয়েছিল। মূলত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা ইউটোপিয়া থেকে সমাজতন্ত্রকে পরিণত করেন বিজ্ঞানে এবং তাতে করে সশস্ত্র করেন প্রলেতারিয়েতকে। (সেলেজনেভ ও অন্যান্য, ১৯৮৮ : ৩১) সেই চিন্তা থেকেই কবিতায় এমন উক্তি। মূলত আশির দশকে সামরিক শাসনে ঢাকা ও সেনানিবাসকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়। এ কারণেই তিনি সেই শহুরে-শাসককে বলেন এমন কথা, 'সামান্য তক্‌লিফ করে মাঝে মধ্যে গ্রামে যেতে হবে।' কারণ ভদ্রবেশে যারা হিজলতলীর সুখ জবর-দখল করে রেখেছে তাদের পরিচয় হিজলতলীর মানুষেরা জেনেছে। একারণে কবি অনুভব করেন 'একটা কিছু তো আজ যথার্থই সমীচীন।' আর হিজলতলীর সুখ ফিরিয়ে দেবার জন্য কবির প্রয়োজন দুই ইঞ্চি জায়গা–যেখানে কবি করবেন 'বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ' :

ক্ষোভ নেই লাবণ্যের পুষ্টিহীনতায়,
যাবতীয় সার ও সোহাগ দিয়ে
একনিষ্ঠ পরিচর্যা দিয়ে
যোগ্য করে নেবো তাকে কর্মিষ্ঠ কৃষকের মতো। (হেলাল, ২০০৩ : ৫০)

এই 'কৃষক'তো সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী কবি হেলাল হাফিজ। ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর 'সদ্যস্বাধীন মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে শ্রেণি সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্টার [প্রতিষ্ঠার] লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে...'। (আলীম, ২০১৮ : ৯৪) হেলাল হাফিজ সেই লক্ষ্যেই 'দুই ইঞ্চি' জায়গা চান। আর সে জায়গাতেই মেহনতি মানুষকে করবেন শ্রেণিসচেতন– যেন তাঁরা বলতে পারেন :

হেলায় খেলায় অনেক বেলা ফুরিয়েছে দিন
অবহেলা প্রপীড়িত মানুষেরা শোধ চায় ঋণ, (হেলাল, ২০০৩ : ৫৪)

এ-তো স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সত্তর দশকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদী জাসদের সেই 'শ্রেণি-সংগ্রাম'র ডাক। যেখানে কবি তাঁর ভালোবাসার মানুষটিকেও বলতে পারেন 'লাল শাড়িটা তোমার পরে এসো'। আসলে শোষিত-ব্যথিত-মেহনতি মানুষের প্রতি এক প্রবল সহানুভূতি থেকেই কবির এ বোধ। ব্যক্তিজীবনেও যেমন তিনি বিষয়াদির প্রতি নিরাসক্ত, তেমনি কবিজীবনেও তাঁর সেই নিরাসক্তি কাজ করেছে। ফলে সত্তর-আশির রাজনৈতিক উত্তালে তিনি সমাজতান্ত্রিক বীক্ষাটিকেই আঁকড়ে ধরেছেন। চেয়েছেন গণমানুষের মুক্তি। আর সে কারণেই তিনি বলেন :

সবাই জমায় টাকা,
আমি চাই মানুষ জমাতে! (হেলাল, ২০২০ : ৭৩)

৪.

কবিতা সম্পর্কে একটা নিজস্ব বোধ, চিন্তা ও দর্শন প্রত্যেক কবিরই থাকে। এই বোধ, চিন্তা ও দর্শনের মেলবন্ধনেই তাঁরা বক্তব্যকে কবিতায় রূপ দেন। কবিরা কখনো কখনো সেই বোধকেই কবিতা করে তোলেন কিংবা কবিতার মাধ্যমে কবি ও কবিতার সম্পর্ককে তুলে ধরবার চেষ্টা করেন। যেমনটা করেছেন হেলাল হাফিজ। তিনি মনে করেন :

কবির জীবন খেয়ে জীবন ধারণ করে
কবিতা এমন এক পিতৃঘাতী শব্দের শরীর,
কবি তবু সযত্নে কবিতাকে লালন করেন,
যেমন যত্নে রাখে তীর
জেনে-শুনে সব জল ভয়াল নদীর।(হেলাল, ২০০৩ : ৪১)

হেলাল হাফিজ এখানে কবির সঙ্গে জনক আর কবিতার সঙ্গে জন্মের তুলনা করেছেন। কিন্তু কবিজনক কবিতারূপ এমন সন্তানের জন্ম দেন যে জন্মের পর হয়ে ওঠে পিতৃঘাতী। প্রকৃত অর্থে তাই। শব্দের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করা এই 'সন্তান' জনক থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই মুক্তি পায়। পাবলো নেরুদাও তেমনটি বলেছিলেন, 'শব্দকে তুলে নিয়ে আমি নেড়েচেড়ে দেখি/ যেন সেটি মানুষের শরীর ছাড়া অন্য কিছু নয়' (সফিউদ্দিন, ২০১০: ৩২৬)। অর্থাৎ শব্দের শরীরে থাকে মানুষেরই ব্যথা, বেদনা, সুখ, শোক এমনই বিচিত্র অনুভূতি। এইসব অনুভূতি কবিকে আগে নিজের সত্তায় ধারণ করতে হয়। সেই সুখ বা শোককে নিজের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে অনুভব করতে হয়−তারপর সেই অনুভূতিতে শব্দেরা ভ্রূণ হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে−তারপর তার জন্ম হয় কবিতারূপে। আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫) যেমন বলেছিলেন, 'ঝিনুক নীরবে সহো/ ঝিনুক নীরবে সহে যাও/ ভিতরে বিষের বালি, মুখ বুঁজে মুক্তা ফলাও!' (হাসান, ২০০৭ : ১২৪) এভাবেই কবিকে মুক্তোরূপ কবিতার জন্ম দিতে হয়। আর সেই কবিতার জন্ম দিয়ে কবিকে বিমোক্ষণ (Catharsis) লাভ করতে হয়−অর্থাৎ একধরনের বিশোধন ঘটে কবির। তারপর আবার নতুন কোনো অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। সে জন্যই হেলাল হাফিজ বলেন :

কবিতা তো কেঁদে ওঠে মানুষের যে কোনো অ-সুখে,
নষ্ট সময় এলে উঠানে দাঁড়িয়ে বলে−
পথিক এ পথে নয়
'ভালোবাসা এই পথে গেছে'। (হেলাল, ২০০৩ : ৪৩)

এই অ-সুখ অসুস্থতা নয়। মানুষের ক্লান্তি, হতাশা আর নৈরাশ্যের অনুভূতি। এইসব অনুভূতি কবিকে উপলব্ধি করতে হয় ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় চেতনা দিয়ে। সে চেতনা থেকেই নষ্ট সময়েও পথিককে দেখাতে হয় ভালোবাসার পথ। বোদলেয়ার আর র‍্যাঁবো কাব্যজগৎ সম্পর্কে এমনটি ভেবেছিলেন :

> অদৃশ্যকে দেখতে হবে, অশ্রুতকে শুনতে হবে, ইন্দ্রিয়সমূহের বিপুল ও সচেতন বিপর্যয় সাধনের দ্বারা পৌঁছাতে হবে অজানায়। জানতে হবে প্রেমের, দুঃখের, উন্মাদনার সবগুলি প্রকরণ, খুঁজতে হবে নিজকে, সব গরল আত্মসাৎ করে নিতে

হবে। পেতে হবে অকথ্য যন্ত্রণা, অলৌকিক শক্তি, হতে হবে মহারোগী, মহাদুর্জন, পরম নারকীয়, জ্ঞানীর শিরোমণি। আর এমনি করে অজানায় পৌঁছানো। (সফিউদ্দিন, ২০১০ : ২২)

এই অজানায় পৌঁছাতে হলে কবিকে শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছেই যেতে হবে–জানতে হবে মানুষের সেই 'অ-সুখ'কে। আর নিজের কাব্যাত্মায় সেই 'অ-সুখ'কে ধারণ করে লিখতে হবে মানুষেরই জন্য। হেলাল হাফিজ এই দর্শন থেকে তাই বলেন :

আজন্ম মানুষ আমাকে পোড়াতে পোড়াতে কবি করে তুলেছে,
মানুষের কাছে এও তো আমার এক ধরনের ঋণ। (হেলাল, ২০২০ : ৬৩)

৫.

বিষয় হলো কবিতার আত্মা আর শিল্পরূপ হলো তার শরীর। মানবজীবনে যেমন আত্মা ও শরীর অবিচ্ছেদ্য, কবিতার ক্ষেত্রেও তাই। বিষয় ছাড়া কবিতা ভাবহীন আর আঙ্গিক ছাড়া প্রকাশহীন। শিল্পের মূল বিষয় হলো ভাব আর সেই ভাবের প্রকাশকৌশলই তাকে কবিতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করে তোলে। হেলাল হাফিজের কবিতার পাঠকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ তাঁর প্রকাশকৌশল। সেই প্রকাশকৌশলের মধ্যে ছন্দ অন্যতম। কেননা, 'ছন্দ হচ্ছে শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনি-সৌন্দর্য।' (লতিফ, ১৯৯৬ : ১) এই ছন্দ ব্যবহারে হেলাল হাফিজের বৈচিত্র্য রয়েছে। তিনি স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও গদ্যছন্দ এ চার প্রকার ছন্দের ব্যবহার করেছেন তাঁর এ পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতাগুলোয়। এর মধ্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কবিতা লেখার প্রবণতা তাঁর সবচেয়ে বেশি। অক্ষরবৃত্তের নিম্ন স্বরগ্রাম তাঁর কবিতার মেজাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবিতায় তিনি কখনো পাঠককে আদেশ করেন না, অনুরোধ করেন–মেজাজে বিদ্রোহী হলেও তিনি 'বিনীত বিদ্রোহী'। এ কারণে অক্ষরবৃত্তের প্রয়োগ বেশি। এরপরেই তাঁর কবিতায় আহবানের সুরে স্বরবৃত্ত ছন্দ গতি সৃষ্টি করে। কিছু কবিতা গদ্যছন্দেও লেখা। তবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতা সবচেয়ে কম–মাত্র ৪টি। তবে ছন্দ ব্যবহারে কিছু কিছু কবিতায় মাত্রার অসম বিন্যাস লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

এখন যৌবন যার/ মিছিলে যাবার তার/ শ্রেষ্ঠ সময় ২১ মাত্রা
এখন যৌবন যার/ যুদ্ধে যাবার তার / শ্রেষ্ঠ সময় ২০ মাত্রা

'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' কবিতার বিখ্যাত এই চরণদুটিতে দেখা যায় যে, তিন পর্বের প্রথম চরণের পর্বের মাত্রাবিন্যাস ৮+৮+৫ এবং দ্বিতীয় চরণে ৮+৭+৫। প্রথম চরণে ২১ মাত্রা এবং দ্বিতীয় চরণে ২০ মাত্রা। দুই চরণে মাত্রার অসাম্য রয়েছে। অক্ষরবৃত্ত অনুযায়ী প্রথম চরণে হওয়ার কথা ৮+৮+৬। এমন মাত্রাবিন্যাস ধরলে প্রথম চরণে ১ মাত্রার ঘাটতি রয়েছে আর পরের চরণে ঘাটতি রয়েছে ২ মাত্রার। একইভাবে :

কেউ আসে রাজপথে সাজাতে সংসার
কেউ আসে জ্বালিয়ে বা জ্বালাতে সংসার।

এখন চরণটিতে প্রথম পর্বে ১ মাত্রা কম। কিন্তু দ্বিতীয় চরণে 'বা' লাগিয়ে সে শূন্যতা পূরণ করা হয়েছে। ফলে তার মাত্রাবিন্যাস হয়েছে ৮+৬=১৪ মাত্রা। তবে এ ব্যাপারে কবির অভিমতটি এমন : 'আমি ছন্দ মেনে ছন্দের নিয়ম ভেঙেছি। আমার অনেক কবিতার ক্ষেত্রে দেখবে কবিতাটা অক্ষরবৃত্তে রচিত মনে হলেও আসলে কিন্তু গদ্যকবিতা। ...আমি প্রতিটি কবিতার চরণ ভাগ করেছি সমমাত্রিক পর্বে, হয় ৮ মাত্রা,

নয়তো ৬ মাত্রা।' (হেলাল, ২০১৪ : ২০২) কিন্তু এমন বক্তব্য অনুসারে অনেক কবিতার মধ্যেই এই মাত্রার সমমাত্রিকতা পাওয়া যায় না–ফলে কবির কথামতো সেগুলো অক্ষরবৃত্তের আদলে অনেক সময় গদ্যকবিতা হয়ে ওঠে। তবে মাত্রার এ অসাম্য উচ্চারণের সময় তালের গুণেই পূর্ণ হয়ে ওঠে। পাঠক নিজেই সেই শূন্যতাটুকু অবচেতনে পূরণ করে নেন। কবিও তেমনি বলেন, 'আমার কবিতার রিদম আছে বলেই লোকে সহজে মনে রাখতে পারে।' (হেলাল, ২০১৪ : ২০২) এই 'রিদম' সৃষ্টির জন্যই তাঁর কবিতায় অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রভাব বেশি। অন্যদিকে গদ্য ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার কম।[২]

৫.১.

ছন্দের সঙ্গে কাব্যভাষার রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৪ : ৩১) ফলে ছন্দের গতিটা প্রকাশ পায় কবিতার শব্দব্যবহারের মাধ্যমে। কবিতাকে গভীর ভারবাহী করার জন্য হেলাল হাফিজ অকারণে তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন না। শব্দকে কবিতার চরণে তিনি বসতে দেন স্বাভাবিকভাবে। ফলে ভাবের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে তাঁর প্রায় প্রতিটি কবিতায়। তবে জোড়শব্দ ব্যবহারে তিনি যে শব্দবন্ধ তৈরি করেন তা নিঃসন্দেহে ব্যঞ্জনাবহ। যেমন 'সংসার বিরাগী', 'দুর্বিনীত যৌবন', 'অংকুরিত অগ্লুৎসব', 'লাজুক চঞ্চু', 'নিটোল স্ট্রাটেজি', 'শৈল্পিক তাবিজ', 'চৈত্রের চিতা', 'অদ্ভুত বন্ধ্যা', 'উর্বরা ফাগুন', 'জ্যেষ্ঠ শামুক', 'ধ্রুপদী আকাশ', 'পুষ্পিত বিজ্ঞান', 'উজাড় যমুনা', 'চতুর আষাঢ়', 'বুকের গেরস্থালি', 'পরিপুষ্ট প্রেমিক', 'বিনীত বিদ্রোহী' এমন শব্দবন্ধ বাংলা কবিতায় মৌলিক। বিশেষ্য পদের পূর্বে কবির স্বনির্বাচিত বিশেষণ ব্যবহারে শব্দবন্ধটি ব্যঞ্জনাবহ হয়ে ওঠে। তবে, এমন পরিশীলিত শব্দ ছাড়াও হেলাল হাফিজ ব্যবহার করেছেন 'হারামজাদী', 'চুত্‌মারানি' এমন সম্বোধনবাচক শব্দ। পাশাপাশি 'ভোলাইয়া', 'ঠগাইবেন','অহনো', 'দেখতাছি', 'অইবোই', 'পোলা', 'চিডি', 'মাইর', 'রাইত' এমন আঞ্চলিক শব্দও ব্যবহার করেন কবি। তবে কবিতার মেজাজ অনুযায়ী শব্দগুলো ব্যবহারের ফলে আরোপিত না হয়ে সর্বজনবোধ্য হয়ে ওঠে। তবে কিছু শব্দের প্রতি রয়েছে কবির নিজস্ব পক্ষপাত। যেমন, বুক, অশ্লীল, ভুল, মৌলিক, চারু, সতীন, আশ্রম এই শব্দগুলো কবি একাধিকবার ব্যবহার করেন ভিন্ন ভিন্ন কবিতায়। তবে একই শব্দ একই কবিতায় বারবার ব্যবহারের প্রবণতাও দেখা যায় হেলালের কবিতায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, *যে জলে আগুন জ্বলে* কাব্যের ''ইচ্ছে ছিলো" কবিতার কথা। কবিতাটিতে 'ইচ্ছে ছিলো' শব্দটি বারবার কোরাসের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬)র "রাষ্ট্র মানেই লেফট রাইট" "তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা", শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)-এর "স্বাধীনতা তুমি", "ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯", "তোমাকে পাবার জন্য হে স্বাধীনতা" এইসব কালোত্তীর্ণ কবিতাতে এমন পুনরুক্তির কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। 'প্রকৃতপক্ষে পুনরুক্তি ও তালিকার এই বিশেষ আঙ্গিকটি আহৃত হয়েছে ইংরেজ কবি Adrian Henri-এর কবিতা থেকে।... একটি ধ্রুবপদকে বারবার ফিরিয়ে আনা এবং বিবিধ প্রেক্ষিত থেকে একটি ঘটনাকে বর্ণনার এই কৌশল হেনরির

মজ্জাগত।' (আশরাফ, ১৯৯৪ : ৩৯-৪০) হেনরির এ কৌশলটি ষাটের দশকের কবিদের বেশ প্রভাবিত করেছিল। হেলাল হাফিজ 'ইচ্ছে ছিলো' এই একটি শব্দকে কবিতায় বারবার ব্যবহার করে ইচ্ছেটাকেই বড় করে বিচিত্র চিত্রকল্পে (Image) প্রকাশ করেছেন। তবে কবিতার শেষে 'শুধু তুমি অন্য ঘরে' এমন সমাপ্তিচরণের প্রয়োগ করে কবিতায় নাটকীয়তা সৃষ্টি করেন। কারণ এই চরণটি শোনার জন্য পাঠক মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। শুধু নাটকীয়তা নয়, হেলাল হাফিজ গল্পের আবহে কিছু কবিতা নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। *যে জলে আগুন জ্বলে* কাব্যের "শামুক" এমনই একটি কবিতা। আবার একই কাব্যের "হিজলতলীয় সুখ" কবিতাটি 'বলাই বাহুল্য আমি রাজনীতিবিদ নই, সুবক্তাও নই' বলে বক্তৃতার ঢঙে শুরু হচ্ছে এবং পুরো কবিতাটি বক্তৃতার ঢঙেই লেখা হয়েছে। কিন্তু "ব্যবধান" কবিতাটিতে কবিতার চেয়ে বক্তব্যই বড় হয়ে উঠেছে। 'নদীর মৌনতা নিয়ে মুগ্ধ মানুষ' এমন দুএকটি চরণ কবিতাটির 'পতন' রোধ করে। "তৃষ্ণা" কবিতাটিকে সেই পতন থেকে বাঁচানো যায়নি। কবিতাটি পুরোপুরি ব্যক্তির নিজস্ব বক্তব্য হয়ে উঠেছে। চিত্রকল্প-সৃষ্টিতে হেলাল হাফিজ কবিতায় অতিবর্ণনার আশ্রয় নেন না। কবিসত্তায় আগে কোনো চিত্রকে কল্পনা করেন এরপর সেই কল্পনাকে সংক্ষিপ্ত শব্দায়োজনে একটি পূর্ণ ইমেজ তৈরি করেন। যেমন 'যে জলে আগুন জ্বলে' কাব্যের "অমীমাংসিত সন্ধি" কবিতায় :

> অপূর্ণতায় নষ্ট-কষ্টে গেলো
> এতোটা কাল, আজকে যদি মাতাল জোয়ার এলো
> এসো দু'জন প্লাবিত হই প্রেমে
> নিরাভরণ সখ্য হবে যুগল-স্নানে নেমে।

স্তবকটিতে 'মাতাল' অর্থাৎ উচ্ছল জোয়ারের চিত্র ভেসে ওঠে। সেই জোয়ারে প্রেয়সীকে প্রেমিকের সঙ্গে 'প্লাবিত' হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে। সেই প্লাবনে ভাসতে ভাসতে 'যুগল-স্নানে' তাদের 'সখ্য' হবে। আর সেই 'সখ্য'টি হবে 'নিরাভরণ'। শব্দটি হওয়ার কথা 'নিরাবরণ'। চিত্রকল্পে জোয়ার-প্লাবনে যুগল-স্নানের যে রসাবহ সৃষ্টি হয়েছে তাতে আবরণহীন হওয়ারই কথা। কবি 'নিরাভরণ' শব্দটি ব্যবহার করে হয়তো তাদের দুজনকে 'প্রাকৃত' থেকে রক্ষা করেছেন। কারণ সেই স্নানে তিনি শুধু সেই যুগলের আভরণ খুলে নিয়েছেন, আবরণ নয়।

৫.২.

হেলাল হাফিজের কবিতার অন্যতম বড় শক্তি তার অলংকার। বিশেষ করে অনুপ্রাস ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত। আদি, মধ্য ও অন্ত্যমিলের ব্যবহারের কারণে তাঁর কবিতা সহজে পাঠকচিত্তে স্থান করে নেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বেদনাকে বলেছি কেঁদো না' কাব্যের "ব্রহ্মপুত্রের মেয়ে" কবিতার একটি স্তবক দেখা যায় :

> বেদনা আমাকে নিয়ে আশৈশব খেলেছে তুমুল, আর
> তিলে তিলে শিখিয়েছে সহনশীলতা,
> নিলাজ নখের মতো দুঃখ কেটে কেটে আমি
> আজকাল অর্জন করেছি মৌন উদ্ভিদের মুখর স্তব্ধতা,

স্তবকটির দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে 'তা' এর অন্ত্যমিল দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রথম চরণে ব, আ ধ্বনি, দ্বিতীয় চরণে ত, শ ধ্বনি তৃতীয় চরণে ন, ক, ম ধ্বনি, চতুর্থ

চরণে আ, জ, ক, ম ধ্বনির বারবার ব্যবহারে ধ্বনিসাম্যের ভিত্তিতে ঘটেছে অনুপ্রাস। অনুপ্রাসের পাশাপাশি উপমা ব্যবহারে দারুণ দক্ষ হেলাল হাফিজ। ‘কী দারুণ বেদনা আমাকে তড়িতাহতের মতো কাঁপালো তুমুল’, আমার একেকটি দুঃখ একেকটি দেশলাই কাঠির মতন’, ‘পাঁজরের নাম করে ওসব সংগোপনে সাজিয়ে রেখেছি আমি সেফ্‌টি-ম্যাচের মতো বুকে’, ‘নারী তুমি আমার ভিতর হও প্রবাহিত দুর্বিনীত নদীর মতন’, ‘কিশোরীর বুকের মতন সাদা ভোরবেলা’ এমন উপমা ব্যবহারে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য নির্মাণ করেন। আবার আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বা বিসদৃশ কিন্তু ভাবের গভীরতায় তা সম্ভব এমন বিরোধাভাস অলংকারের ব্যবহারও দেখতে পাওয়া যায় হেলাল হাফিজের কবিতায়। যেমন, ‘কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয়’, ‘শাশ্বত শান্তির যারা তারাও যুদ্ধে আসে’, ‘একদিন একটি বেহালা নিজেকে বাজাবে বলে’, ‘পৃথিবীর তিন ভাগ সমান দু’চোখ যার’, ‘সর্বভূক [সর্বভুক] এ কবিতা কবির প্রভাত খায়’ এইসব বিরোধাভাস মূলত কবিতায় বিপরীতার্থক ভাবানুভূতি প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হেলাল হাফিজ কবিতায় ব্যক্তিগত রোমান্টিক ভাবানুভূতি প্রকাশে অতিশয়োক্তি অলংকারের ব্যবহার অনেক করেছেন। ‘অসহায় একটি অঙ্গুরী / কনিষ্ঠা আঙুলে এসেই বলেছিলো ঘর’, ‘নিউট্রন বোমা বোঝ / মানুষ বোঝ না’, ‘বৃক্ষ হারালে তার সবুজ পিরান, মৃত্তিকার ফুরালে সুঘ্রাণ’ ‘এই নাও বাম হাত তোমাকে দিলাম’ এমন বাকবন্ধে উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে। উপমানই সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে অথচ পুরো কবিতা পড়ার পরই বোঝা যায় উপমানটির আড়ালে উপমেয় অর্থাৎ কবির প্রকৃত বক্তব্যের গভীর মর্মার্থ।

৫.৩

ভাব, ভাষা, ছন্দ-অলংকার আর চিত্রকল্পের এমন মেলবন্ধনে হেলাল হাফিজ তাঁর কবিতায় সৃষ্টি করেন কিছু কালোত্তীর্ণ চরণ–বাঙালি পাঠকের কাছে যেসব পরিণত হয়েছে প্রবাদে। যেমন :

i) এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়। (হেলাল, ২০০৩ : ৯)

ii) কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয়। (হেলাল, ২০০৩ : ৯)

iii) এরকম দুঃসময়ে আমি যদি মিছিলে না যাই,
উত্তর পুরুষে ভীরু কাপুরুষের উপমা হবো
আমার যৌবন দিয়ে এমন দুর্দিনে আজ
শুধু যদি নারীকে সাজাই (হেলাল, ২০০৩ : ১১)

iv) প্রেমের প্রতিমা তুমি, প্রণয়ের তীর্থ আমার। (হেলাল, ২০০৩ : ১৬)

v) জন্মাবধি আমার শীতল চোখ
তাপ নেবে তোমার দু’চোখে। (হেলাল, ২০০৩ : ১৫)

vi) দুঃখ তো আমার হাত–হাতের আঙুল–আঙুলের নখ
দুঃখের নিখুঁত চিত্র এ কবির আপাদমস্তক। (হেলাল, ২০০৩ : ১৯)

vii) নারী তুমি শৈল্পিক তাবিজ
এতোদিন নারী ও রমণীহীন ছিলাম বলেই ছিলো

দুঃখের আরেক নাম হেলাল হাফিজ। (হেলাল, ২০০৩ : ২১)

viii) ভালোবাসা যাকে খায়
এইভাবে সবটুকু খায়। (হেলাল, ২০০৩ : ২২)

ix) কতোটুকু দিলে বলো মনে হবে দিয়েছি তোমায়,
আপাতত তাই নাও যতোটুকু তোমাকে মানায়। (হেলাল, ২০০৩ : ৩৩)

x) একটি মানুষ খুব নীরবে নষ্ট হবার কষ্ট আছে। (হেলাল, ২০০৩ : ৪২)

xi) স্বাধীনতা সব খেলো, মানুষের দুঃখ খেলো না। (হেলাল, ২০০৩ : ৪৪)

xii) কেউ ডাকেনি তবু এলাম,
বলতে এলাম ভালোবাসি। (হেলাল, ২০০৩ : ৪৬)

৬.

বিশ শতকের মধ্যষাটে কবিতা লেখা শুরু করেন হেলাল হাফিজ। এ পর্যন্ত কবিতাই লিখেছেন। তবে কবিতার সংখ্যা খুব কম।[৩] প্রথম কাব্য *যে জলে আগুন জ্বলে*তে তিনি যে রাজনৈতিক ও রোমান্টিক উন্মাদনা ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন, পরের কাব্যগুলোতে সেই উন্মাদনা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। প্রথম কাব্যেই তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক চেতনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন কিন্তু সে চেতনারও বিকাশ দেখা গেল না পরবর্তী কাব্যে। এমনকি রোমান্টিক কবিতাগুলোও অনুভূতির পুনরাবৃত্তিতে জড়িয়ে গেল। হেলাল হাফিজের কবিতা এমনিতেই স্বল্পবাকসম্পন্ন। সেই স্বল্পবাকসম্পন্নতা এতটাই সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যে, প্রথম কাব্যের পরে বেশিরভাগ কবিতা ১-২-৩ চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। আবার বক্তব্যের এই সংক্ষিপ্ত প্রকাশই হেলাল হাফিজের কবিতার অন্যতম শক্তি ও বৈশিষ্ট্য। হেলাল হাফিজ মূলত ষাট-সত্তর-আশির দশকের তরুণমেজাজটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর সেই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটালেন একেবারে স্বতন্ত্র স্বরে। নিয়ন্ত্রিত আবেগের ব্যঞ্জনাবহ উপস্থাপন, সময়ের সঙ্গে শব্দের মেলবন্ধন, অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত অথচ সংক্ষিপ্ত প্রকাশে সমসাময়িক কবিদের মধ্যে তিনি সহজেই স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন। বক্তব্যকে ব্যঞ্জনাবহ করে সরাসরি প্রকাশ করার অপূর্ব দক্ষতা নিয়েই তিনি বাংলাদেশের কাব্যজগতে প্রবেশ করেছেন। তবে হেলাল হাফিজ কবিতাকে ভাবের গভীরতায় কোনো বৌদ্ধিক দর্শনে স্থাপন করেন না কিংবা আধুনিক মানবানুভূতির বিচিত্র অনুষঙ্গে বিচরণ করে না তাঁর কবিতা। বিপ্লব আর প্রেম এ দুয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে তাঁর কাব্যজগৎ। তবুও ষাটের দশকের বিদ্রোহ আর প্রতিবাদের মধ্যে তিনি 'দুর্বিনীত ধ্রুপদী টংকার তুলে' 'শিল্প আর স্লোগানের শৈল্পিক মিলন' ঘটাতে পেরেছিলেন তাঁর কবিতায়।

**মূল গ্রন্থ**

*যে জলে আগুন জ্বলে*। (২০০৩)। দিব্যপ্রকাশ, সপ্তদশ সংস্করণ, ঢাকা।

*ভালবেসো একশো বছর*। (১৯৯৪)। ত্রয়ী প্রকাশন, ঢাকা।

*অচল প্রেমের পদ্য*। (১৯৯৪ ক)। ত্রয়ী প্রকাশন, ঢাকা।

*কবিতা একাত্তর*। (২০১৩)। বিভাস, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা।

*বেদনাকে বলেছি কেঁদো না*। (২০২০)। দিব্য প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা।

**তথ্যসূত্র ও টীকা**

১. বিশ শতকের ত্রিশের দশকে চীনকে দুধরনের অবরোধের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত, দেশের অভ্যন্তরে চিয়াং কাই-শেক এবং দেশের বাইরে থেকে অবরোধ সৃষ্টি করে জাপান। মাও সে তুং তাঁর

ঐতিহাসিক লং-মার্চের মধ্য দিয়ে এই দুই অবরোধ মোকাবেলা করেন এবং সফল হন। এই লং-মার্চে তিনি গ্রামের কৃষকদের সঙ্গী করেছিলেন। কাই-শেকের সৈন্যরা কোনো শহর আক্রমণ করলে মাও -এর লাল ফৌজ কাই-শেকের আক্রমণের আগেই শহর থেকে দূরে গ্রামে অবস্থান নিত। কাই-শেকের সৈন্যরা সেই শহর দখল করার পর পুরো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অবস্থান করত। এরকম সময় মাও-এর লাল ফৌজ গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে সেই শহর ঘেরাও করতো এবং কাই-শেকের সৈন্যদের অতর্কিত পরাজিত করত। দ্রষ্টব্য: সুপ্রকাশ রায় (২০০০), *মাও সেতুঙ*, র‍্যাডিক্যাল, পঞ্চম মুদ্রণ, কলকাতা, পৃ. ৭১-৭৬

২. **হেলাল হাফিজের কবিতার ছন্দ নির্মাণ অনুযায়ী শ্রেণিকরণ :**
স্বরবৃত্ত : অন্যরকম সংসার, হিরণবালা, ফেরিওয়ালা, যাতায়াত, তোমাকেই চাই, অমীমাংসিত সন্ধি, প্রস্থান, অচল প্রেমের পদ্য-৩, ৪, ৫, ১২, ১৩, আপনি, ওড়না, স্রোতস্বিনী ভালোবাসা।
মাত্রাবৃত্ত : তৃষ্ণা, হৃদয়ের ঋণ, অচল প্রেমের পদ্য-৮, ১০।
অক্ষরবৃত্ত : নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়, নিরাশ্রয় পাঁচটি আঙুল, অস্ত্র সমর্পণ, বেদনা বোনের মতো, ইচ্ছে ছিলো, প্রতিমা, নিখুঁত স্ট্র্যাটেজি, আমার সকল আয়োজন, দুঃখের আরেক নাম, প্রত্যাবর্তন, তীর্থ, কবিতার কসম খেলাম, পরানের পাখি, বাম হাত তোমাকে দিলাম, শামুক, আমার কী এসে যাবে, ইদানীং জীবন যাপন, পৃথক পাহাড়, অহংকার, কোমল কংক্রিট (পয়ার), নাম ভূমিকায়, সম্প্রদান, একটি পতাকা পেলে, মানবানল, যার যেখানে জায়গা, কবি ও কবিতা, উৎসর্গ, যেভাবে সে এলো, যুগল জীবনী, লাবণ্যের লতা, ভূমিহীন কৃষকের গান, কবুতর, নেত্রকোণা, তুমি ডাক দিলে, হিজলতলীর সুখ, রাখাল, ব্যবধান, কে, ক্যাকটাস, ঘরোয়া রাজনীতি, ডাকাত, সুন্দরের গান, অচল প্রেমেরপদ্য-২,৬, ব্রহ্মপুত্রের মেয়ে, দেয়াল, ধ্রুবতারা, অবেলার খেলা, থুতু, লজ্জা, তাবিজ, ঢেউ, লীলা, বুকের দোকান, অনির্ণীত নারী, পিতার পত্র (পয়ার), সঞ্চয়, কৃষ্ণপক্ষ, জয়, বাসনা।
গদ্যছন্দ : দুঃসময়ে আমার যৌবন, অগ্ন্যুৎসব, উপসংহার, রাডার, রাখালের বাঁশি, অচল প্রেমের পদ্য-১ (সমিল), ৭ (সমিল), ৯, ১১, ঘুড়ি (চাল অক্ষরবৃত্তের), নীল খাম (লোকছন্দ), অশ্লীল সভ্যতা।

৩. *যে জলে আগুন জ্বলে* কাব্যের কবিতা ৫৬টি। *ভালবেসো একশো বছর* কাব্যে পূর্বের কাব্যেরই কিছু কবিতা সংকলিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে এটি কবির মৌলিক কাব্য নয়। বরং *অচল প্রেমের পদ্য*তে কিছু নতুন কবিতা যুক্ত হয়েছে। *কবিতা একাত্তর*-এ *যে জলে আগুন জ্বলে*র ৫৬টি কবিতা ও *অচল প্রেমের পদ্য*র ১৩টি কবিতার সঙ্গে নতুন মাত্র দুটি কবিতা যুক্ত হয়েছে। আবার *বেদনাকে বলেছি কেঁদো না* কাব্যে ২০টি নতুন কবিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে *কবিতা একাত্তর*-এর ১৫টি কবিতা। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত কবিতার সংখ্যা ৯১টি।

## সহায়ক গ্রন্থ


আবুল হাসান (২০০৭)। 'পৃথক পালঙ্ক'। *আবুল হাসান রচনা সমগ্র*। বিদ্যা প্রকাশ, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা।
এস.এম. আবদুল লতিফ (১৯৯৬)। *ছন্দ পরিচিতি*। ইউরেকা বুক এজেন্সী, ষষ্ঠ সংস্করণ, রাজশাহী।
খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৯৪)। *বাংলাদেশের কবিতা অন্তরঙ্গ অবলোকন*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নির্মলেন্দু গুণ (২০১১)। 'মুঠোফোনের কাব্য'। *নির্বাচিতা*। কাকলী প্রকাশনী, সপ্তম সংস্করণ, ঢাকা।
বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৬)। *নৈঃসঙ্গ্যচেতনা*। এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
মজিবুর রহমান জজ (২০১৪)। 'স্মৃতির ভীড়ে হেলাল হাফিজ'। *কষ্টের ফেরিওয়ালা* [গ্রন্থনা রামশংকর দেবনাথ]। বিভাস, বর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা।
মহিউদ্দিন আহমদ (২০১৪)। *জাসদের উত্থান-পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।
মামুন রশীদ (২০১৫)। *ষাটের কবি স্বাতন্ত্র্য ও বৈভবে*, ত্রয়ী প্রকাশন, ঢাকা।
মুহম্মদ আবদুর রহিম, আবদুল মমিন চৌধুরী, এ.বি.এম.মাহমুদ ও সিরাজুল ইসলাম (২০০৬)। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। নওরোজ কিতাবিস্তান, দ্বাদশ সংস্করণ, ঢাকা।
মো. আব্দুল আলীম (২০১৮)। *বাংলাদেশের বাম রাজনীতি বিভ্রান্তি ও বিভক্তি*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
রফিক আজাদ (২০১৬)। 'বিরিশিরি পর্ব'। *কবিতাসমগ্র*। অনন্যা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা।
রফিকউল্লাহ খান (২০০২)। *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*। একুশে পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
(২০০৭)। *কবিতা ও সমাজ*। মাওলা ব্রাদার্স-প্রথম সংস্করণ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০৪ব.)। *ছন্দ* (সম্পা. প্রবোধচন্দ্র সেন)। বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০০)। 'সভ্যতার সংকট'। *প্রবন্ধসংগ্রহ* [সংক. রবিশঙ্কর মৈত্র],সময়, ঢাকা।
রামশংকর দেবনাথ [গ্রন্থনা] (২০১৪)। *কষ্টের ফেরিওয়ালা*। বিভাস, বর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা।
ল সেলেজনেভ, ভ ফেতিসভ (১৯৮৮)। *বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম* [অনু. ননী ভৌমিক]। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।
সফিউদ্দিন আহমদ (২০১০)। *কবিতার বিস্ময়: বোদলেয়ার-র‍্যাঁবো-পাবলো নেরুদা*। জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
সুকান্ত ভট্টাচার্য (২০১০)। 'ছাড়পত্র'। *সুকান্তসমগ্র*। পুনর্মুদ্রণ, চারুলিপি, ঢাকা।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (২০০৬)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।
সুপ্রকাশ রায় (২০০০)। *মাও সেতুঙ*। র‍্যাডিক্যাল, পঞ্চম মুদ্রণ, কলকাতা।
সুভাষ মুখোপাধ্যায় (২০১৪)। 'পদাতিক'। *কবিতাসংগ্রহ১* (সম্পা. সুবীর রায়চৌধুরী)। দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা।
সৌমিত্র শেখর (২০১৪)। 'নিভৃতচারী সোচ্চার কবি হেলাল হাফিজ'। *কষ্টের ফেরিওয়ালা* (গ্রন্থনা রামশংকর দেবনাথ)। বিভাস, বর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা।
হেলাল হাফিজ (২০১৪)। 'সাক্ষাৎকার'। *কষ্টের ফেরিওয়ালা* [গ্রন্থনা রামশংকর দেবনাথ]। বিভাস, বর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা।

[প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'বাংলা গবেষণা সংসদ' থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্যিকী'র বর্ষ: ৬৫।। সংখ্যা: ৫৪।। আশ্বিন ১৪৩১।। সেপ্টেম্বর ২০২৪ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি এখানে এটি পুনর্মুদ্রিত হলো।-সম্পাদক]

**রঙ বেরঙ**

ইকবাল হোসেন

সকাল হলেই বেলকনির ইসিচেয়ারে বসে থাকা। সাথে এক কাপ চা। রিকসাটা দ্রুত ছুটল, লাল ওড়নাটা উড়ছে।
ছেলেটা বারবার তাকে জড়িয়ে ধরছে আবার ছাড়ছে।
দশ বছর বয়সী ছেলেটা দৌড়াচ্ছে...
একটা ফুল নিবেন, একটা ফুল? একটা নুড়ি পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ছেলেটাকে ডেকে বললাম, 'ফুলটা আমাকে দে'।
নাম কীরে তোর?
সোহান।
বাড়িতে কে কে আছে?
দুভাইবোন আর মা।
ফুল বেচে কতটাকা আসে?
দুশ/ তিনশ/ কখনও চারশও হয়।
যা ফুল আছে, কতটাকা দিব?
স্যার সত্যি আপনি সব ফুল নিবেন?
হ্যাঁ।
স্যার একশ টাকা দিলেই হবে। বলে বেলকনির ফাঁকগলিয়ে ফুলগুলো হাতে দিল।
আমি ওকে পাঁচশ টাকার নোট দিয়ে বললাম, এতে হবে?
অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল। চোখের জলগুলো যেন কৃতজ্ঞতায় ভালোবাসা হয়ে ঝরছিল।
শুধু বলল, আমার অনেক বড় উপকার হল, বলেই সালাম দিয়ে ছুটল।
আশ্চর্য কেন ফুল নিলাম, কাকে দিব ফুল? আমার তো ফুল দেবার মানুষ নাই!
সেমন্তিকে অনেক ভালোবাসতাম। ওর জন্য প্রতিদিন ছুটে যেতাম। হাতে থাকত একটা লাল গোলাপ। কাছে গেলেই ও হাত পেতে চোখটা বন্ধ করত। আর আমি হাঁটুগেঁড়ে বসে তার হাতে তুলে দিতাম আর বলতাম, ডু ইউ মেরি মি?
প্রত্যেকবারই ও বলত এ্যানি ডাউট? ইউ মে প্রসিড বলে হা হা হা করে হেসে উঠত আর বলত পাগল একটা! যদিও ওর চোখেমুখে স্বর্গীয় সুখের চিহ্ন দেখতে পেতাম।
ওর প্রেমে রীতিমত হাবুডুবু খাচ্ছি। সারাদিন মাথার মধ্যে শুধু একটাই চিন্তা- কী করে ওর সামনে যাওয়া যাবে, ওর মনমাতানো হাসিটা দেখতে পাব? যে হাসিতে দুনিয়া জয় করার মত সাহস খুঁজে পাই। সেমন্তি আমার ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠল।
খুব সুন্দর চলছিল। আঘাতটা আসল আচমকা। বাবা স্ট্রোক করল। মাস দুয়েক লড়াই শেষে ওপারে পাড়ি দিলেন। সংসারের বড় সন্তান। অনেক দায়িত্ব কাঁধে পড়ল। মায়ের দেখাশোনা, ছোট দুভাইবোনের পড়াশুনার খরচের জোগান দিতে দিতে নিজের কথা হারিয়ে গেল। মাত্র কমাসের ব্যবধানে আমি যেন এক অন্যমানুষ! সেমন্তি বেশ কবার

আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে। একদিন সময় করে গেলাম, দেখা হল, চুপ করে বসে আছি। কই আমার গিফট?
আমি বললাম কীসের গিফট?
সব ভুলে গেছ?
আমার মনে পড়ল, তাইতো আমি ফুল নিয়ে আসিনি। হেঁটেগেঁড়ে বসিওনি।
তুমি কি আমাকে ভুলে যাচ্ছ?
নাতো তা কী করে সম্ভব!
তাহলে!
তাহলে আবার কী! অনেক ঝামেলায় থাকি। সময় করতে পারছি না।
ওর চোখদুটো ছলছল। চোখের জল মুছে দিয়ে বললাম, থাকো যাই।
মাঝে আবার কয়েকমাস... আবার জরুরি তলব
ছুটলাম, দেখা হল।
বাসা থেকে আমার বিয়ের জন্য সন্মন্ধ খুজছে।
আমার বুকের মধ্যে যেন ধড়াস করে উঠল। তবুও সাহস নিয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম- এ মুহূর্তে আমার দ্বারা বিয়ে অসম্ভব। সবে গ্রাজুয়েশন শেষ হল। কিছুই এখনও শুরু করি নি। আয় রোজগারের কোন ব্যবস্থা নাই।
তোমার বাসায় কী বলব? একজন বেকারের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে কোন বাবা মা কখনও চাইবে না। আমি কী বলে তাদের সামনে দাঁড়াব?
সেমন্তি বলল, ঠিক আছে, বুঝলাম। তুমি একটু ভেবে দেখ কী করবে।
আমি যেতে পারিনি ওর বাবা মায়ের সামনে।
একদিন এক সরকারি কর্মকর্তার সাথে ওর বিয়ে হয়ে গেল।
নীলার সাথে প্রায় একযুগ। বড় আদুরে, সংসারী। কখন কী দরকার ওকে বলা লাগেনি কখনও। বিয়ের পাঁচ বছর পর থেকে সন্তানের জন্যে চেষ্টা শুরু কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় তা আলোর মুখ দেখেনি। আমার মধ্যে হতাশা কাজ না করলেও নীলা বিষয়টি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন থাকত। আমাকে মাঝে মাঝে আরেকটি বিয়ে করতে বলত।
উত্তরে বলতাম, তুমি কি পাগলি হয়েছ? চুপ কর এই বেশ আছি বলে বুকের মাঝে টেনে নেয়। চোখটা কিন্তু উদাস।
তমাল নীলাকে বুঝতে না দিলেও একটা চাপাকষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছে। সে ভাবে আমার অবর্তমানে একটা সন্তান থাকলেও বউটা ওকে আশ্রয় করে বাকি জীবনটা কাটাত।
নীলা ব্যাপারটা আঁচ করলেও কিছু বলতে পারে না। তমাল অফিস থেকে এসে বেলকনির ইজি চেয়ারে শরীরটা ছেড়ে দেয়। দুকাপ চা নিয়ে এসে পাশাপাশি বসে তারা। এ গল্প সে গল্প করে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর উঠে। সন্ধ্যার পর রোজকার মতই পাড়ার ক্লাবের উদ্দেশ্যে তমাল বেরিয়ে পড়ে।
হঠাৎ একদিন নীলা ভীষণ অসুস্থ হয়ে যায়। বাসায় কেউ ছিল না। অফিস থেকে এসে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম।
ডাক্তার বলল, শরীর খুব দুর্বল। বিশ্রাম দরকার, মানসিক চাপ কমাতে হবে। বাসায় নিয়ে আনলাম।

সারাদিন অফিসে থাকি। ওর দিকে খেয়াল করতেই পারি না। শ্বাশুড়ি এসে গ্রামের বাড়ি নিয়ে গেল। কয়েকদিন পর খবর আসল নীলা আর নেই। কিছুদিন পর আমিও চাকরি থেকে অবসর নেই।
সেদিন বসে আছি। মুষলধারে বৃষ্টি। একটি মেয়ে ভিজতে ভিজতে এসে দাঁড়াল- বেলকনির গ্রিল ঘেঁষে। ভিজে চুপসে গেছে। বললাম ভিতরে এসে বসো। বৃষ্টি ছাড়লে চলে যেও। তবুও সে অনেকক্ষণ নড়ল না কিন্তু অবিরাম বৃষ্টির কারণে সে বাধ্য হয়ে ভিতরে আসল। নীলার একটা শাড়ি বের করে দিলাম- তুমি পুরোপুরি ভিজে গেছ। দ্রুত চেঞ্জ করে নাও, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।
বাসায় আর কে থাকে, কাউকে দেখছি না কেন?
একা থাকি।
মেয়েটি যেন চমকে উঠে। নিরুপায় হয়ে চেঞ্জ করল। মনে হল ভয় পেয়েছে।
আমিও কোন কথা না বলে চুপ থাকলাম।
একটুপরে বলে আংকেল বাসাটা একটু দেখতে পারি?
নিশ্চয়ই।
আমার পড়ার ঘরে গিয়ে মেয়েটি চিৎকার দিয়ে উঠেছে। দৌড়ে গিয়ে দেখি সে বইগুলো দেখছে, অবাক হচ্ছে আর নিজে নিজে বকবক করছে- এত্ত বই! এবার আমি সাহস করে বললাম, তোমার নাম কী?
স্বপ্না।
কী কর?
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। ইংরেজি তৃতীয় বর্ষে। আপনার সংগ্রহে এত বই- শেকসপিয়র, তলস্তয়, এলান পো, এরিস্টটল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মানিক, তারাশঙ্কর, জীবনানন্দ, মোহিতলাল, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, নির্মলেন্দু গুণ কী নেই এখানে। সত্যিই আপনার পড়ার ঘর দেখে আমি মুগ্ধ।
মেয়েটির কথা শুনে ভীষণ আনন্দ লাগছে। ঐ বয়সে আমরা বইয়ের সংস্পর্শে থাকতে চাইতাম না কিন্তু ওর আগ্রহ আমাকে কৌতূহলী করে তুলল। কোথায় বাসা? বাবা মা কী করেন?
নিভে যাওয়া প্রদীপের মত অন্ধকার হয়ে গেল মুখটি।
বাবা নেই। সংসারে মা-ই তার একমাত্র অবলম্বন। আমি আর কিছুই বলতে পারিনি।
এরপরে মাঝে মাঝে বইপ্রেমী মেয়েটি আসত, বই পড়ত, গল্প করত, আমাকে চা বানিয়ে খাওয়াত। বেশ ভাল সময় কাটছিল। একদিন মেয়েটা ফোন করে বিয়ের দাওয়াত করল আর বলল, আপনাকে কিন্ত আসতেই হবে, অনেকগুলো বই চাই উপহার হিসেবে।
একদিন বসে আছি। কয়েকজন মানুষের জটলা। কিছুক্ষণের মধ্যে জটলাটা আরও দীর্ঘ হল। নেতাগোছের একজন আসল, চলে গেল। শুরু হল মারামারি। একজন পথচারী নিহত। 'আমার লোক, আমার লোক' স্লোগানে মিছিল, মিটিং। সন্তানদের নিয়ে অসহায় মায়ের আহাজারি। কজন মানুষ তাদের খোঁজ রাখে!
সময়ের সাথে সাথে তারাও হয়ত একদিন সংসার নামক এ বন্ধুর পথে ঠিক চলতে শিখবে।

এখনও নিত্য অভ্যাসে এক কাপ চা নিয়ে বসি বেলকনির ইজি চেয়ারটায়। রাস্তায় বিভিন্ন আকৃতির গাড়ি দেখি, যন্ত্রদানব মানুষদের ছুটোছুটি দেখি আর ভাবি... জীবনের গল্প তো ফুরোয় না, হারায় না বরং প্রতিনিয়ত তার সাথে নতুন নতুন ঘটনা যুক্ত হয়। নতুন নতুন লক্ষ স্থির হয়। সে মোতাবেক ছুটোছুটিও শুরু হয়। প্রজাপতিরা আসে ভালোবাসার নতুন নতুন রঙে। নতুন নতুন অনুভূতিতে তৈরি হয় হাজারো স্বপ্ন। স্বপ্নের দল নিয়ে যায় নতুন দ্বারে। নতুন অনুভূতি, নতুন গল্প। তারই তরে ছুটে চলি জীবনের আয়োজনে।

## কথোপকথন-১ : ইদ্রিস ও আমি
মিজানুর রহমান

সন্ধ্যা পার হয়েছে অনেকক্ষণ। বাজার এখনও জেগে আছে। মোড়ের বাঁকেই রিকশা পেয়ে গেলাম। চালক বয়সে তরুণ। মাথায় লাল ক্যাপ। আমার হাতে কিছু কাগজ।
বললাম, যাবে ?
বলল, কোথায় যাবেন ?
বললাম, কলেজ রোডে যাও।
প্যাডেল চালিত রিকশা। একটু পুরনো। জোরে চালাচ্ছিল। বললাম, ধীরে ধীরে যাও।
রিকশাওয়ালা ধীরে ধীরে চালাতে শুরু করলো।
কলেজ গেইটে এসে দাঁড়ালো।
'ভেতরে যাব স্যার?
'না। তুমি সোজা চলতে থাক। '
বাজার থেকে এখনও দু এক জন মানুষ ফিরছে। হঠাৎ রাস্তায় দেখা যাচ্ছে। মানুষের জীবন বড় বিচিত্র। আটপৌরে সংসারে তেল-নুন -লাকড়ি'র ফর্দ আর সময়ের চাকার ঘর্ঘর, বৃত্তবন্দি জীবন। হিসেবের খেরোখাতায় নিত্য আঁকিবুকি। যোগ-বিয়োগের প্রাত্যহিক সমীকরণ। রুটিন , কর্মঘণ্টা, দেনা-পাওনা, দেয়া-নেয়া আর সময়ের হিসাব-নিকাশ । প্রতিটি মুহূর্তের পাই পাই বিশ্লেষণ। কত কত কাজ !
আচ্ছা, এর বাইরের পৃথিবীটি কি নেহাত ছোট ?
মোটেই ছোট না।
রিকশা চলছে। কতক্ষণ হলো ঠিক নেই।
রিকশার তরুণ ছেলেটি বলল,
এখন কোন দিকে যাব স্যার?
বললাম, বামে যাও।
বাম দিকে চলতে চলতে এক সময় থেমে গেল।
বলল, স্যার, কাঁচা রাস্তাও শেষ । আর রাস্তা নাই। মাঠ। '
নেমে পড়লাম। সত্যিই মাঠ । মাঠ কি না ঠাহর করাও কঠিন।
ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুগজ সামনেও বোঝা যায় না। নিজের শরীর পর্যন্ত দেখা যায় না।
আচ্ছা, আজ কী বার ? এত অন্ধকার কি বারে হয় ?
ঘন অন্ধকারে নিজেকে অশরীরী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি এ পৃথিবীর কেউ না। অন্ধকারের বিপুল শরীর আচ্ছাদিত করেছে আমাদেরকে। অন্ধকারের গহীন সাগরে নিমজ্জিত দুটি প্রাণ।
বড় নিঃশব্দের জগৎ। মানুষ নেই, পশু নেই, পাখি নেই, আলো নেই ..এ এক নৈঃশব্দের পৃথিবী !
রিকশাওয়ালার ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া বাদ বাকি নিঃস্তব্ধতা।
চালক ছোকরা বলল,
' স্যার, এখানে এলেন কেন? কী করবেন ?

' এই শোন। তোমার নাম কী ?
' আমার নাম স্যার ইদ্রিস। '
ইদ্রিস, বলতো, অন্ধকারের উল্টা কী ?
স্যার, আলো।
আলো কী ?
স্যার, জানি না। যা দেখা যায় ..
শোন, আলো হল ইলেকট্রোনের প্রবাহ ..জানো ?
ইদ্রিস নিরুত্তর।
কোন পর্যন্ত পড়েছ ?
স্যার, বেশি না। থিরি..
তাহলে জানার কথাও না। শোন, আলোই যত সমস্যা । কেবল ভেদ তৈরি করে। ছোট -বড়, সুন্দর -অসুন্দর দেখায়। দেখো, তোমার আর আমার মাঝে কোন ভেদ নেই , এখন একই । তোমার মাথার ক্যাপটি খুলো।
সে ক্যাপ খুলে হাতে নিল।
দেখো, তোমার লাল ক্যাপ আর আমার হাতের সাদা কাগজ এখন একই, না ?
ইদ্রিস বলল, হ্যাঁ ,স্যার।
আবার তোমার ও আমার .. নিজেদের মধ্যে কোনো পার্থক্যও দেখতে পাচ্ছি না। উজ্জ্বল শপিংমলের সামনে কি তোমার সাথে এতক্ষণ এত আন্তরিকতা নিয়ে কাছাকাছি এসে কথা বলতাম ? কিংবা চাইনিজের গেইটে, কমিউনিটি সেন্টারের সামনে ? বলতাম না। কেননা, সেখানে আলো ছিল। আলো পার্থক্য তৈরি করে, অহং তৈরি করে নিরুৎসাহিত করতো। তার মানে, আলো হলো পৃথিবীতে সকল বৈষম্যের মূল। আর এই আলো হলো জ্ঞান।
জ্ঞান যত বিস্তৃত হচ্ছে মানুষ তত পার্থক্য তৈরি করছে। বাইরের পাশাপাশি অন্যের অন্তরের খবরও পড়ছে। দূরবীণ দিয়ে দেখছে ভেতরটা। স্ক্যান করছে আত্মা। '
জানো ইদ্রিস, পৃথিবীতে মানুষের সেরা জিনিসটি কী ?
না, স্যার। জানি না।
বিশুদ্ধ আত্মা।
আচ্ছা, ইদ্রিস, বলতো অন্ধকারের কোন রূপ আছে ?
ইদ্রিস বলল, জানি না স্যার।
বললাম, দেখ চারপাশে কী নিবিড় অন্ধকার ! নিঃশ্বাস নিলে কেমন যেন শান্তি শান্তি লাগছে, না ? শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন,
'এই যে আমার সম্মুখে দিগন্তপ্লাবী ঘন নিবিড় অন্ধকার আচ্ছন্ন করিয়াছে .. .কোন্ মিথ্যেবাদী প্রচার করিয়াছে যে আলোরই কেবল রূপ রহিয়াছে, অন্ধকারের নাই ? '
সুতরাং অন্ধকারের রূপ আছে। বুঝলে ইদ্রিস?
শরৎচন্দ্রের কথা কি মিথ্যে হবে ?
ইদ্রিসের জবাব দেবার আগেই দরজার কড়া নাড়ছে সহকর্মী। বলে উঠল, হবে স্যার। আসুন।
স্ট্যাটাস লেখা বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলুন।

দরজা খুলে দেখি চার পাঁচ জনের হাসিমাখামুখ।
আমি বললাম, কোথায়?
একজন বলে উঠল, আপনি তো স্যার বিপিএল-এ একাকীই রাজশাহী কিংস। আমরা সবাই ঢাকা ডাইনামাইটসের পক্ষে জেতার কারণে খাওয়াব না ?
ঠিক আছে। চলেন । মোড়ে যাচ্ছি... গভীর রাতে না কি এখানটায় পরাটা ভাল পাওয়া যায়। সাথে মুরগির গরম লটপটি, কাঁচা পেঁয়াজ -মরিচ কুচি কুচি ..
ইদ্রিসটা যে কোথায় গেল ? ..

## একটা অপারেশনের আত্মকাহিনী

মো. সোলাইমান আলী

ডাক্তারের নির্দেশনা মোতাবেক সকাল ১০ টার মধ্যেই হাসপালে চলে এলাম বৌসহ। হাসপাতালে রিপোর্ট করে সাধারণ কিছু টেস্ট করে ও রক্ত প্রদান করে শুরু হলো অপেক্ষার পালা। দু'জন দু'জনের সাথে কোন কথা না বলে, সকল কথা মনেমনে বলে সকালটা কোন রকমে কাটল। ব্যাগে কয়েকটা স্লাইস পাউরুটি আর দু'টো কলা ছিলো সেটা দিয়ে দুপুরে হাল্কা নাস্তা করলাম। দুপুরের দিকে ক্ষিদে লেগে গেল। হাসপাতালে খাবার দিবে কি না তা জানতাম না। ডাক্তার কখন আসবেন সেটাও বলতে পারছেন না কেউ। হাসপাতালের দায়িত্বরত অফিসারকে দুপুরের খাবার দিবেন কিনা জিজ্ঞেস করাতে বললেন, স্যার, আপনি তো এই হাসপাতালের রোগী নন, আপনি ডাক্তার স্যারের ব্যক্তিগত রোগী তাই আপনাকে কোন খাবার হাসপাতাল থেকে সার্ভ করা হবে না। আমি বৌকে বললাম, তুমি খেয়ে এসো, আমি পরে গিয়ে খেয়ে আসছি। তার খাবার ইচ্ছে নেই বলে আমিই বাইরে থেকে খেয়ে আসলাম।

বিকেল চারটার দিকে ডা. আল্লাম চৌধুরী আসলেন। বললেন, ইয়াংম্যান কেমন আছেন? আলমগীর স্যার ফোন করে বললেন, আপনি নাকি খুব ভয় পাচ্ছেন? এখানে বলে রাখি যে, আলমগীর হলেন আমার বন্ধু আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপচার্যের পিএস। বললাম, ভালো আছি, একটু আধটু ভয় তো লাগছেই। আসলে আমার ভোকাল কর্ডে টিউমার ধরা পড়েছে। আমি জানি যে, আমার গলা কেটে টিউমার অপারেশন করবে। যদিও ডাক্তার বা আমার প্রিয়জনেরা বলেছেন, গলা কাটবে না, গলার ভেতর দিয়ে অপারেশন করবে। আদৌ আমার গলার জোড়া আর লাগবে কিনা কিংবা সেলাইগুলো যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে যা খাবো তা গলা দিয়ে বের হয়ে যাবে, নিশ্বাস আর নাক দিয়ে বের না হয়ে গলার কাটা যায়গা দিয়ে বের হয়ে যাবে! আদৌ আমি বাঁচবো তো? বাড়িতে আমার মা, বড় ভাবি, খালারা, আদরের বোনেরা রোজা রেখেছে, যাতে আমার অপারেশন ভালো হয়, সাকসেসফুল হয়। আমি মহা চিন্তায় আছি এই ভেবে যে, আমার বিয়ের বয়স মাত্র ছয় মাস হলো, এই মুহুর্তে যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার বৌটা বিধবা হয়ে যাবে? সে আবার কাউকে বিয়ে করে নতুন সংসার শুরু করবে!! আমার বৌ কারো হবে ভাবতেই আমার জেদ বেড়ে গেলো। ভাবছি, আমি মরেও মরবো না তাও বৌটাকে কারো হতে দিবো না। নতুন নতুন বিয়ে তো, তাই প্রেমটা তখন উথলিয়ে উথলিয়ে পড়তো! ডাক্তার এরপর বললেন, আজকে রিপোর্ট পাইলে সন্ধ্যার পরে অপারেশন হবে। ভারি কিছু খাবেন না। নয়লে অপারেশ পিছিয়ে যেতে পারে।

এ কথা শুনে কিছুই বলতে পারলাম না। তখন নার্স এসে বললেন, সকাল থেকে কিছু কি খেয়েছেন? খাবেন না। রাত আটটার দিকে আপনার অপারেশন করা হবে। বললাম, এটা এমন কথা। সারাদিন চলে যাবার পর বলছেন খাবেন না। এটা তো সকালেই আপনাদের বলা উচিত ছিল। দুপুরে আমি বাইরে থেকে ভাত খেয়ে এসেছি। আপনার দায়িত্ব আপনি সঠিকভাবে পালন করলেন না। গ্যাস্টিকের ট্যাবলেটের কথা বলতে

এসেছিলেন শুধু। তারা কোনো উত্তর দেয় না। ক'টার সময় ভাত খেয়েছি তা জানতে চায়লেন।
সমস্যা হলো, আমি কখন ভাত খেয়েছি তা এখন মনে নাই। ওই যে সংশয় পিছু ছাড়ে না। শয়তানটা আশপাশে কোথাও বসে থাকে। যখনই কোন কিছু নিশ্চিত হতে চাই, টুপ করে আমার মাথার মধ্যে ঢুকে পড়বে। তারপরও একটা সময় ধরে ঠিক করা হলো রাত আটটার সময় অপারেশন হবে। কয়েকদিন পিছিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই ভালো। এই জঘন্য হাসপাতালে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না।
রাত আটটার খানিকটা আগে সার্জারি রুমের পাশে একটা বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। হাতে লাগানো হলো স্যালাইন। এর আধঘণ্টা পর ডা. চৌধুরী এলেন। সঙ্গে আরো দু'জন ছিলেন। খুব একটা কথা বললেন না। দ্রুত অপারেশন টেবিলে শুয়ে পড়লাম। এক হাত স্যালাইনের কারণে লম্বা করে রাখছি, অন্য হাত মাথার নিচে। একজন মুখের মধ্যে একটা চোঙের মতো জিনিস দিলেন। তারপর সেখানে টেপ লাগিয়ে দিলেন।
তিনজনে কথা বলতেছেন আর এটা সেটা করছেন। পায়ের দিকে কিছু তারের মতো জিনিস জড়ানো হলো। এই ভেবে ভয় পাচ্ছিলাম যে, পা ছোড়াছুড়ি করবো নাকি। মুখ বন্ধের কারণে জিজ্ঞাসাও করা যাচ্ছিল না। এরই ফাঁকে তাঁদের কিছু কথা-বার্তা শুনে গা হিম হয়ে আসলো। আগেই জেনেছি অ্যানেস্থেশিয়ার মাধ্যমে অজ্ঞান হওয়া ভয়ংকর একটা ব্যাপার। যেন ফাঁদে পড়ে যাওয়া, মৃত্যু নয়, আর যদি জ্ঞান না ফেরে! আর এখন তাঁরা মৃত্যু নিয়ে রসিকতা করছে!
আর আমি এদিকে ভাবছি, আমাকে যতই অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়া হোক না কেন, আমি জ্ঞান হারাবো না, আমি চুপটি মেরে নিশ্বাস না নিয়ে শুয়ে থাকবো। দেখতে চাই তাঁরা আমার সাথে কি করেন। ডা. চৌধুরী সম্ভবত অপারেশন টেবিলে মারা যাওয়া কোনো এক রোগীকে নিয়ে কিছু বলছিলেন, আর তিনজনই হাসছিলেন। আমি বলতে লাগলাম, ভাই, আপনারা দেখছেন না যে, আমি এখানে শুয়ে আছি, একটু পর তো অজ্ঞান করবেন। এইসব ভয়ংকর কথা বন্ধ করুন। কিন্তু কথাগুলো আমার ভেতরেই রয়ে গেল। মুখ খোলা গেল না। পা নাড়ানোর চেষ্টা করলাম, সেটাও হলো না। তাঁদের হাসাহাসির মাঝে একজন আমার দিকে এগিয়ে এলেন। চোঙে লাগানো টেপ খুলে একটা নল আমার মুখে মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন অ্যানেস্থেশিয়া! বললেন, একটু জোড়ে নিশ্বাস নেন তো। আমি সুবোধ বালকের মতো জোড়ে নিশ্বাস নিতে শুরু করার মধ্যেই আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম!
লোকজনের অস্পষ্ট কথাবার্তা ও আলোর মাঝে জ্ঞান ফিরলো। ততক্ষণে আমার হাল্কা জ্ঞান ফিরে এসেছে। চোখে আকাশের তারা দেখছি, এমন অবস্থা। অ্যানেস্থেশিয়ার ঘোর সহজে কাটছিল না। এমতাবস্থায় একজন নার্স এসে পায়ের কাছে দাঁড়ালো। আমি নার্সকে দেখে অ্যানেস্থেশিয়ার ঘোরের মাঝেও পুলকিত বোধ করলাম। নার্স তো নার্স নয়, যেন আকাশ ফুঁড়ে দুইজন পরী নেমে এসেছে আমার সেবার জন্যে! আমি অবাক হয়ে চেয়েই থাকলাম! মিছে চোখ বন্ধ করলে যদি পরীরা চলে যায়, আর যদি তাদের দেখতে না পাই, তাহলে আমার এই জীবন রেখে কি হবে! তারচেয়ে অপারেশন টেবিলে জীবন চলে যাওয়ায় ভালো। আমার বেহায়াপনা অবস্থা দেখে নার্স সম্ভবত বুঝতে

পেরেছিলো যে, অ্যানেস্থেশিয়ার ঘোর এখনো পুরোপুরি কাটেনি। সে নিশ্চিত হবার জন্যে হাতের কয়টা আংগুল তুললো জানিনা, বললো এখানে কয়টা আঙ্গুল? আমি বললাম, দুইটা। সে আমাকে আর কিছু না বলে ডানা মেলে আকাশে চলে গেলো। আরও ঘণ্টাখানেক বা এর আগে-পরে একজন ওয়ার্ডবয় ও আমার খালাতো ভাই ফজলু মিলে দুই জনের কাঁধে ভর করে টলতে টলতে কেবিনে যাওয়ার পথেই ওয়াক করে বমি করে দিলাম। তারা দুইজনে ধরাধরি করে কেবিনে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলো।

খাওয়া-দাওয়া বন্ধ, গলায় খুব তৃষ্ণা; এভাবে শুয়ে পড়লাম। পেট ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। এক হাতে স্যালাইন লাগানো। ভয় হচ্ছিল মাঝরাতে হয়তো শেষ হয়ে যাবে, কেউ টের পাবে না। যদি রক্ত ওঠে। সারারাত ঘুম আসে নাই। পেট ফুলে থাকায় গ্যাসের যন্ত্রণা। আমার বেডেই বৌ শুয়ে পড়েছে। ফজলুকে কিছুক্ষণ পর বললাম, আমি ঘুমিয়ে গেলে স্যালাইন শেষ হলে খুলে ফেলিস। এই করে করে সেই স্যালাইন শেষ হলো সকাল ৮টার দিকে। সকাল হতেই বাসায় যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেছি। হাসপাতালে লোকেরা বলছিল, খারাপ লাগলে থাকতে। কিন্তু থাকার কোনো দরকার ছিল না। কাগজপত্র রেডি করতে করতে অনেকটা সময় চলে গেল। ডা. চৌধুরীর সাথে আর দেখা হলো না। একজন নার্স ওষুধ বুঝিয়ে দিয়ে বললেন এক সপ্তাহ পর যেন ডা. চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করি। নিজেই বিল পরিশোধ করে একটা রিক্সা ডেকে তিনজন মিলে কাজীপাড়ার বাসায় রওনা হলাম।

## প্রণয়বিয়োগ বিরহী

ফারজানা মেহবুব শায়লা

নিপুন আনমনে হাঁটতে হাঁটতে হলে ফিরছে। শেষ বিকেলের এই সিগ্ধ প্রকৃতি তাকে মায়ায় জড়িয়ে রাখে। চারুকলা থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেনের এই নির্জন রাস্তা, পুকুরপাড়, মেহগনি গাছের সারি তাকে পৌঁছে দেয় তার গন্তব্য তাপসী রাবেয়া হলে। আর এই পথই তাকে ভুলিয়ে দেয় সকল শূন্যতা। বিশেষ করে শেষ বিকেলের এই সময়টা যখন কপোত-কপোতী একান্তে নিজেদের সময়টুকু কাটাতে চান তাদের দেখেই নিপুনের মন চনমনে হয়ে ওঠে। সবার খুনসুটি গুলো দেখতে দেখতে সে হলে ফেরে। হল ওর আশ্রয়, ওর ভালোবাসার জায়গা। হলে ফেরার একটু পরেই খালার কল 'পার্সেল এসেছে '। দৌড়ে উড়ে উড়ে নেমে এলো গ-ব্লকের ৩০১ নম্বর রুম থেকে। এটা জানে পার্সেলটি কে পাঠিয়েছে কিন্তু কী পাঠিয়েছে সেটা জানা যাবে পার্সেলটি খোলার পর। গত তিন বছরে ওর ঠিকানায় অনেক পার্সেল এসেছে একজনের কাছ থেকে। কখনও শাড়ি, চুড়ি,গহনা,ফুল, চকলেট, গল্পের বই একেক সময় একেক জিনিস তবে সেগুলো বিভিন্ন অকেশনে। কিন্তু আজ তো কোন অকেশন নেই, তাহলে আজ কি পাঠালো অয়ন! ভাবতে ভাবতে পার্সেলটি রিসিভ করে রুমে নিয়ে আসলো।রুমে এসে পার্সেলটি না খুলে আগে গোসল সেরে নিয়ে রাতের রান্নার আয়োজন করতে বসল, টুকটাক অল্প কিছু রান্না। অন্য কেউ হলে প্রথমেই প্যাকেটটি খুলে দেখতো কী আছে ভেতরে। কিন্তু নিপুন এক্ষেত্রে একেবারে আলাদা টাইপ, সে তার কৌতুহল জিইয়ে রাখে বহুক্ষণ। সব কাজ শেষ করে ঘুমোতে যাবার আগে খুলবে তার আগে ভাবতেই থাকবে কী আছে, একেকবার একেকটা ভাববে। এতেই ওর আনন্দ। সবশেষে অয়নকে ফোন করবে আর চলতেই থাকবে মাঝরাত পর্যন্ত তাদের ফোনালাপ। গত দুই দিন অয়নের সাথে কথা বলা হয়নি, ছোট্ট বিষয়ে অভিমান করে ফোন কেটে দিয়েছিল নিপুণ।এরপর আর অয়ন ফোন করেনি , নিপুনও করেনি। আজ পার্সেল পেয়েই নিপুনের সমস্ত অভিমান শেষ কারণ এটা অয়ন হয়তো অভিমান ভাঙানোর জন্য পাঠিয়েছে। তাই প্যাকেটটি না খুলেই অয়নকে ফোন করল। কিন্তু অয়ন ফোন রিসিভ করলো না, দুবার তিনবার না অয়ন ফোনই ধরছে না। নিপুনের আবার খুব অভিমান হলো। তবুও ভাবলো হয়তো ব্যস্ত একটু পরে ঠিক ফোন দিবে। অয়নের সাথে পরিচয় বছর তিনেক আগে... হঠাৎই একদিন রাত সাড়ে দশটায় আননোন নাম্বার থেকে একটা ফোন আসে কিন্তু নাম্বার অপরিচিত দেখে সে রিসিভ না করে করে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতে থাকে। আবার ফোন আসে একই নাম্বার থেকে, এবার সে হ্যালো বলে কিন্তু অপরপ্রান্তে একজন পুরুষ মানুষের কণ্ঠ শুনে নিপুন কিছুটা বিব্রত হয় কারণ ছেলেটি দুটো লাইন বলে "ওগো কাজল নয়না হরিণী আমি হারায়েছি নিজেরে, তোমার মায়াময় কোমল মুখখানীর তরে "। ছেলেটি চুপ হয়ে যায় আর কোন কথা বলে না। নিপুনও একেবারে বাকহারা হয়ে গেছে কী বলবে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছেলেটি ফোন কেটে দেয়।এরপর থেকে প্রতিদিন একই সময়ে ছেলেটি ফোন করে। প্রথম কয়েকদিন নিপুন প্রথম কল ধরে না কিন্তু দ্বিতীয়বার দিলে ফোন রিসিভ করে চুপ করে থেকে শুধু শোনে। আর ছেলেটি ২/৩টি করে কবিতার লাইন বলে কিছুক্ষণ মৌন থেকে ফোন কেটে দেয়। নিপুন কোন

কথা বলতে পারে না আবার কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারে না লজ্জায়। কয়েকদিন পরে প্রথম তাদের কথা হয় ছেলেটি নিজেই তার পরিচয় দেয় আর নিপুণকে কোথায় দেখেছে তাও জানায়। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে তাদের কথা শুরু হয়। প্রথম প্রথম শুধু অয়ন ফোন দিলেও কিছুদিন পর থেকে নিপুনও ফোন করতে থাকে। নিজেদের ভাব বিনিময় করে তবে অয়ন বেশিরভাগ সময় কবিতা বলে নিপুনকে আপ্লুত করে। দিন দিন অয়নের প্রতি, অয়নের কবিতা, তার কথা বলার ধরণ, তার ফোন নিপুনকে খুব করে টানে। একদিন কথা না হলে খুব কষ্ট হয়। প্রতিদিন নিয়ম করে কথা হয়। বিভিন্ন অকেশনে কুরিয়ারের মাধ্যমে গিফট আদান প্রদান হয় নিয়ম করেই। অয়ন নিপুনকে বলেছে কোন এক বিয়ে বাড়িতে তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল অয়ন। অনেক কষ্ট করে নিপুণের ফোন নাম্বার জোগাড় করেছে সে। অয়ন খুব একটা বেশি কিছু বলেনি নিজের কথা আর নিপুনও তেমন কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। কথা বলেছে আর শুনেছে সম্মোহনের মতো। শুধু জানে অয়ন ঢাকা কলেজে পড়ে এটুকুই। তিন বছরে একবার দেখাও করেনি তারা। অয়ন কখনও বলেনি আর নিপুণও লজ্জায় কিছু বলেনি। প্রতিদিন রাতে নিয়ম করে তারা কথা বলতো এতেই অয়নের প্রতি ভালোবাসা, বিশ্বাস অনেক শক্তপোক্ত হয়ে উঠেছিল। অয়ন বলতো নিশ্চয় দেখা হবে কোন একদিন আর সবশেষে ভালোবাসা ও বিশ্বাসে এক হবে তারা। নিপুনের চাওয়া খুবই কম। বন্ধুর সংখ্যাও খুব একটা বেশি না। যে দু চারজন কাছের বন্ধু তারাও অয়নের কথা কেউ জানে না। নিপুণ খুবই ইন্ট্রোভার্ট টাইপের। বাবা-মায়ের এক মাত্র সন্তান। চারুকলার ছাত্রী হিসেবে নিজের কাজেই মনোযোগী সে। ক্লাস করে আর ক্লাস ওয়ার্ক করেই দিন কেটে যায় ওর। মন খুলে যতটুকু কথা বলেছ তা অয়নের সাথেই। দুদিন ধরে কথা হয় না তারপর আবার আজকেও কল ধরে না অয়ন। হয়তো এখনও নিপুনের ওপর রাগ করে বসে আছে। এসব ভাবতে ভাবতে পার্সেলটি নিয়ে খোলা শুরু করলো। কী সুন্দর একটা ময়ূরকণ্ঠী নীল রংয়ের শাড়ি আর একটা বক্সে নীল রংয়ের রেশমি চুড়ি। সাথে একটা চিঠি " খোলা আকাশের নীচে ময়ূরকণ্ঠী নীল শাড়ি চুড়িতে ভালোবাসার অপ্সরা নেমে আসবে মর্ত্যে আর আমি মুগ্ধ নয়ন মেলে তাকিয়ে থাকবো তার পানে। আমাদের দেখা হবে ১৬ই মে দুপুর ১২ টায় তোমার হলের সামনে থাকবো তোমার অপেক্ষায়, সে পর্যন্ত না হয় বিরহেয় কাটুক দুজনের সময়টুকু। ভালো থেকো প্রিয় "

পুনমের যেন পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখের সময় এখন। প্রতিনিয়ত ভেবেছে কবে দেখা হবে ওদের। শেষ পর্যন্ত সে সময়ের কাছাকাছি চলে এসেছে তারা। আর মাত্র একদিন পরেই দেখা হবে তাদের। কত কিছু ভাবছে। কী করবে কী বলবে আরও কত কিছু। আজ আর চোখে ঘুম আসে না পুনমের। ওর ঘুম যেন কেউ নিয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতেই ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ সে আর ক্লাসে যায় না। সারাদিন ধরে প্রস্তুতি নেয় কিভাবে যাবে অয়নের সামনে। দুপুরের পর চলে যায় নিউমার্কেটে, অয়নের জন্য টুকিটাকি কিছু গিফট কিনে তারপর আড়ংয়ে গিয়ে শাড়ির সাথে রংয়ের মিল রেখে একটা নীল পাঞ্জাবি কেনে, যদিও মাপ সে জানে না তবুও আন্দাজে কিনে ফেলে। আজ সে খুব উচ্ছল ও প্রাণবন্ত দিন পার করল। হলে ফিরে সব কিছু গুছিয়ে রেখে পুনম ঘুমাতে গেল। রুমে অবশ্য তার রুমমেটেরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ঘটনা কী কিন্তু ও কাউকেই কিছু বলেনি চুপ করে ছিল তাই রুমমেটরাও কিছু জিজ্ঞেস করেনি আর। কিন্তু ঘুম তার কোথায়?

তার যেন সময়ই কাটছে না। কখন দুপুর ১২ টা বাজবে। অয়নের সাথে কথা হয়নি আর। কথা বললে বলতো যেন আরও সকাল সকাল আসে। কেন এতো দেরি করবে? পুনমের যেন আর তর সই না।সকালে ঘুম থেকে উঠল কিন্তু আজও সে ক্লাসে গেল না। রুমমেটরা সবাই ক্লাসে চলে গেছে। পুনম মনে মনে ভাবছে ভালোই হলো রুমে এখন সে শুধু একা। সে নিজের মতে করে পরিপাটি করে সাজিয়ে অয়নের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করবে। কেন এতো সাজছে? কে আসবে? কোন প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না তাকে। সময়ের সাথে সাথে নিজেকে সে পরিপাটী করে সাজিয়ে বসে আছে অয়নের অপেক্ষায়। সময়ের আগেই রেডি হয়ে গেছে এখন শুধু অপেক্ষা অয়নের কলের। সে বসে বসে ভাবছে কখন বারোটা বাজবে, কখন যাবে অয়নের সামনে, কী কথা বলবে তার সাথে সব গুলিয়ে ফেলবে না তো? আজ অয়নকে কথা দিবে আর কখনও অভিমান করে কথা না বলে থাকবে না কেউ ই। কারণ এই ৩ দিন পুনমের খুব কষ্টে কেটেছে অয়নের সাথে কথা বলতে না পেরে। আজ সব কষ্টের শেষ হবে। এতোদিনের অদেখা প্রিয় মানুষটাকে আজ প্রাণ ভরে দেখবে। নানা ভাবনার মাঝে বারো টা পেরিয়ে যায়। পুনম অপেক্ষা করে অয়নের ফোন কলের। সে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে... ভেবেছিল অয়ন এসে ওকে কল করবে কিন্তু সময় বেলা ১টা পেরিয়ে গেছে তখন পুনম অয়নকে ফোন করল -কেন দেরি করছে জানার জন্য কিন্তু ফোন বন্ধ বলছে। বারবার ফোন বন্ধ বলছে। পুনম তো কনফিউজড হয়ে যায়। সে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। মনকে প্রবোধ দেয় সে হয়তো ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছে তাই অয়ন কল দিতে পারছে না। সে ঘড়ি দেখে এখনও দেড়টা বাজে নি। রুমমেটরা রুমে আসার আগেই ওকে বেরুতে হবে রুম থেকে তা না হলে ওরা নানারকম প্রশ্ন করবে যার উত্তর পুনমের কাছে নেই। সে ছবি আঁকার সব সারঞ্জাম নিয়ে হল থেকে বেরিয়ে এসে হলের গেটের কাছাকাছি ছবি আঁকানোর ক্যানভাসটি সেট করে নিয়ে বসে রইল অয়নের আসার অপেক্ষায়। যেন সবাই ভাবে সে ছবি আঁকতে বসেছে। ৩ টা পেরিয়ে যায় সে বসেই আছে তবুও অয়নের কোন খোঁজ নেই। বারবার ফোন করছে কিন্তু বারবার একই কথা সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সে ভেজা চোখেই হাতে রং-তুলি তুলে নেয়। আঁকতে থাকে তার মনের অনুভূতি। হলের গেটে একগুচ্ছ কাঠগোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে নীল পাঞ্জাবি পরিহিত একটি ছেলে আর অপরপ্রান্তে ময়ূরকণ্ঠীর নীল শাড়ি ও চুড়ি পরে একটি মেয়ে হলের গেট পেয়িরে এগিয়ে আসছে ছেলেটির দিকে। মেয়েটির মুখে মোহনীয় হাসির ছটা দেখা যাচ্ছে। আর ক্যানভাসের প্রকৃতিও যেন ওদের উচ্ছ্বাসে ঝলমল করে উঠেছে। একমনে সে এঁকে চলেছে। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এলো সেদিকে তার মনোযোগ নেই। ছবিটা আঁকানো শেষ হলে পুনমের চোখ থেকে অবিরল ধারায় বর্ষণ নামা শুরু হলো.... কী ভেবছিল আর কী হলো আজ তার সাথে। কেন অয়ন এমন করলো? সে কোন ভাবের নিজেকে আর প্রবোধ দিতে পারে না। আস্তে আস্তে সব গুছিয়ে নিয়ে রুমে ফিরে এলো। রুমের সবাই তো ওকে দেখে অবাক এই লাজুক মেয়েটি আজ শাড়ি পরে সেজেছে। ভীষণ সুন্দর লাগছে তাকে! সবাই খুব প্রশংসা করে কিন্তু পুনমের চোখ দেখে ওদের খটকা লাগে, কিছু একটা হয়েছে - বাকি রুমমেটরা বলাবলি করতে থাকে কিন্তু ওকে কিছু জিজ্ঞেস করে না কারণ তারা জানে কোন উত্তর পাবে না। পুনম খুব চাপা স্বভাবের

মেয়ে.... পুনম ফ্রেশ হয়ে এসে শুয়ে পড়ল । সারাদিন না খাওয়া তবুও আর কিছু খেতে ইচ্ছে করলো না। অন্যদিনের মতো রাত সাড়ে দশটায় অয়নের ফোনের অপেক্ষায় রইল। সময় পেরিয়ে গেলে সে অয়নকে ফোন করল বারবার কিন্তু একই কথা..... বন্ধ ফোন। পুনম ভেতরে ভেতরে অনেক ভেঙে পড়লো তবুও কাউকে কিছু বলতে পারল না। তার বিশ্বাসের আর ভালোবাসার জায়গাটা নড়বড়ে হয়ে গেছে। বহুদিন পেরিয়ে গেছে আর কখনও তার অয়নের সাথে যোগাযোগ হয়নি। ক্যাম্পাস জীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে। আজও অপেক্ষায় অভিমানী মন নিয়ে একাকি পথ চলছে। তৈরি হয়নি আর তার কোন ভরসার জায়গা। সে জানেনা কতটা পথ তার একাকি পাড়ি দিতে হবে। হয়তো সারাজীবন নয়তো কেউ আসবে যে নিয়ে আসবে সুদিন.... সেই অপেক্ষায়। (অয়ন রিহ্যাবের চারদেয়ালের মাঝে বন্দি। মাত্রাতিরিক্ত নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণের কারণে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে পুনমের সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগের দিন ১৫ মে দুপুরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং একটু সুস্থ হওয়ার পর রিহ্যাবে পাঠানো হয়। সে প্রচুর পরিমানে নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করত। আর প্রতিদিন নেশা করেই পুনমের সাথে কথা বলতো। পুনমের সাথে কথা বলাটাও তার একধরনের নেশা ছিল। কিন্তু সত্যি ই সে পুনমকে ভীষণ ভালোবাসতো। কিন্তু আজ সে আর কিছুই মনে করতে পারে না। মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ হয়ে আছে। কখনও কি ফিরবে সে স্বাভাবিক জীবনে? হয়তোবা, হয়তো না, সেই অপেক্ষা।)

## লাইফ ইজ সো বিউটিফুল

সুমিকা পাল

এই শালটি নিতে পারেন আঙ্কেল। এ রঙ সবাইকে মানায়। রিনরিনে মিষ্টি গলায় সেলসের মেয়েটি কথাগুলো বলে স্মিত হেসে এগিয়ে গেল। আমার হাতের শালটির দিকে ইশারা করে  জানতে চাইলো এটা নেব কী না ? কী একটা কালার যেন চট্ করে বললো মেয়েটি ঠিক বুঝলাম না। তবে আমার কাছে শালটি নস্যি রঙের বলে মনে হলো। এই বয়সী ছেলে-মেয়েদের অনেক শব্দ অবশ্য আমি ঠিক বুঝি না। "ও লেভেল" পড়ুয়া নাতনিটার সাথে কথা বলতে গেলে মাঝে মাঝে থমকে যাই। নিজেকে আরও বেশি প্রাচীন মনে হয়। আজকাল সব এত দ্রুত বদলে যায়! একটিতে অভ্যস্ত হতে না হতেই অন্যটি এসে হাজির। এ বলে আমাকে নাও, ও বলে আমাকে দেখ ; এমন অবস্থা।

শাহানা অবশ্য অনেকটা তাল রাখতে পেরেছে। নাতি-নাতনিদের দেখাশোনা করতে করতে অনেক কিছু আয়ত্ত করেছে। ছেলে,ছেলের বউ যার যার অফিস, কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। নাতি-নাতনিদের দেখাশোনার ভার আমার আর শাহানার উপর। তবে ওদের বেশি হই-চই, সারা শব্দ নেই। ল্যাপটপ, ট্যাব এসবেই দৃষ্টি নিবদ্ধ, মিউট জেনারেশন এরা। মাঝে মাঝে ওদের ডেকে গল্প করার চেষ্টা করি কিন্তু জমে না।

মেয়ে গত বছর ইদে শাহানাকে স্মার্ট ফোন কিনে দেয়েছে। ওরা খুলনায় থাকে। মেয়ে কলেজে শিক্ষকতা করে আর জামাই ইঞ্জিনিয়ার ওদের সাথে মাঝে মাঝে ভিডিও কলে কথা হয়। ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ এসবে শাহানা কিছুটা অভ্যস্ত হয়েছে। আমার জরুরি প্রয়োজনে এখনও বাটন ফোনেই স্বস্তি।

বিকেলে আশপাশের অ্যাপার্টমেন্টের মধুমেহ রোগগ্রস্থ মহিলাদের সাথে শাহানাও নিয়মিত হাঁটে। বেশ কিছুদিন হলো তাকেও এ রোগ দখল করেছে। শ্যামলা রঙের মাঝারি উচ্চতায় এখন অনেকটা ভারিক্কি ভাব এসছে। হাঁটার সঙ্গীদের সাথে ম্যাসেঞ্জর না কী হোয়াটসঅ্যাপে কীসে যেন একটা গ্রুপ আছে। ফেসবুকেও কিছু পুরোনো বান্ধবীদের খুঁজে পেয়েছে। মাঝে মাঝে তাদের দেশ-বিদেশের ভ্রমণের ছবি দেখে। আমাকেও দেখায়। আসলে আমাকে দেখায় তার দীর্ঘদিনের দমিয়ে রাখা, জমিয়ে রাখা ক্ষোভ।

এটাও তো ঠিক, জীবনে সে অনেক টানাপোড়েন সহ্য করেছে। অনেক আকাঙ্ক্ষার বিসর্জনও দিতে হয়েছে। মধ্যবিত্ত জীবনে যা হয়, সাধ আর সাধ্যের সমন্বয় করতে করতে বেলা গড়িয়ে সন্ধে হয়ে যায়। হাউজ বিল্ডিংয়ের লোন পেয়ে বনশ্রীতে বাড়ি করার সময়ও কিছু টাকার ঘাটতি পড়ল। অন্য কোনো দিক থেকে টাকা ম্যানেজ করার উপায় ছিল না। তখন শাহানা নির্দ্বিধায় ওর গহনা বের করে দিয়েছে। আমার অবশ্য তাতে মোটেও সায় ছিলনা কিন্তু সেই ভরসা দিয়েছে। সংসারে ছোটো-বড়ো অনেক ধকল সামলেছে নির্বিকার ভাবে।

তবে ইদানিং শাহানার মেজাজের পারদ খুব উঠানামা করে। মাঝে মধ্যে আগ্রহ নিয়ে ওর সাথে গল্প জমাতে গেলে বিরক্ত হয়। আবার চুপচাপ থাকলেও রেগে যায়। তাকে

অবহেলা করছি, এমন কিশোরীসুলভ অনুযোগে অভিমান করে। আজকাল অনেক পুরোনো অপূর্ণ শখ নিয়ে মাঝে মধ্যেই ঝগড়ার আয়োজন করে। তবে আমার মতো দুর্বল প্রতিপক্ষের সাথে একপেশে যুদ্ধে সে নিজেই ক্লান্ত হয়ে যায়।

রিটায়ারমেন্টের পর থেকে গত পাঁচ বছর ধরে সকালে নিয়মিত হাঁটার চেষ্টা করছি। কাছাকাছি বয়সের আরো কিছু ভদ্রলোকের সাথে একটি সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এ বয়সে আর নতুন করে বন্ধুত্ব হয় না, হয় একটি ভদ্রগোছের সম্পর্ক। তাদের সাথে গল্পের বেশিরভাগ জুড়েই থাকে কে, কোন রোগের কবজায় পড়ল তার বিবরণ। জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কিছু টুকরো গল্পও হয় ফাঁকে ফাঁকে। ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে রিটায়ার করা মফিদুল হক প্রায়ই খুব আফসোস করেন। ছেলেমেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রায় সব জমানো টাকা শেষ করেছেন। এখন বৃদ্ধ বয়সে ডাক্তার, ওষুধপত্র এসব প্রয়োজনের বাইরে অতিরিক্ত খরচ হলে ছেলেমেয়েরা বিরক্ত হয়। মাঝেমধ্যে আমার কাছে থেকে দুই,চারশো টাকা ধার করেন গিন্নিকে একটু বালুসাই, শনপাপড়ি খাওয়ানোর জন্য। ছেলের বউ নাকি বিরক্ত হয় এসব ন্যাকামো দেখলে।

“বুড়ি যত দিন বাঁচে একটু-আধটুকু খেয়ে নিক শখ মিটিয়ে। তেমন বেশি কিছু তো আবদার নেই।”কথাগুলো বলতে বলতে মফিদুল সাহেবের গলা ধরে আসে। সিমেন্টের বেঞ্চে রোগা লম্বাটে মানুষটি কাঁধটা সামনে ঝুঁকে বসে পড়েন। চশমাটা আলগোছে খুলে ভেজা চোখদুটো বন্ধ করে ভদ্রলোক বলেন, তার মুত্যুর আগেই যেন স্ত্রীর মৃত্যু হয়। অন্তত বুড়িটাকে যেন কারও অবহেলা সহ্য করতে না হয়। ভাঙাচোরা গলায় কথাগুলো বলে পার্কের সীমানা ঘেষে থাকা জারুল গাছটির দিকে উদাস হয়ে চেয়ে থাকেন। শেষ হেমন্তের সকালটাও কেমন যেন বাতাসহীন দমবন্ধ লাগে। এমন আলোচনায় নিজেকে খুব অসহায় লাগে। ছেলেমেয়েরা তাদের খেয়াল রাখে। হাতে সামান্য কিছু জমানো টাকাও আছে। তবুত কেন যেন শঙ্কা হয়!

কিছুদিন আগে মতিঝিল ব্যাংকের একটি কাজে গিয়ে প্রাক্তন কলিগ আতাহার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। আতা সাহেব বরাবরই বেশ আমুদে টাইপের মানুষ। ব্যাংকের কাজ শেষ করে পাশের একটি টি স্টলে দু-জনে চা খেতে খেতে দেশ-অর্থনীতি-রাজনীতি নিয়ে কথা হচ্ছিল। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এলো প্রাসঙ্গিকভাবেই। তার দুই ছেলে। বড়ো জন আমেরিকা আর ছোটোটি অস্ট্রেলিয়ায় সেটেলড। তারা বুড়ো-বুড়ি দেশেই থাকেন। কালেভদ্রে ছেলেদের কাছে বেড়াতে যান। তবে ছেলেরা দেশে খুব একটা আসতে চায় না। তিনিও এ নিয়ে ছেলেদের জোর করেন না, তাই জানালেন। কথা বলতে বলতে আতাহার সাহেবের ফোন বেজে উঠলো। হঠাৎ গলার সুর কাঁদো কাঁদো করে ফোনে বলতে লাগলেন , “তা বাবা এবার ইদেও তোমরা আসবে না ! আমি আর তোমার মা কত আশা করে ছিলাম !” ইত্যাদি, ইত্যাদি। ফোন রেখে এক গাল হেসে বললেন, বড়ো ছেলে ফোন দিয়েছিল।

-“এবারও ওরা আসবে না। তাই আগে থেকে প্ল্যান করে রেখেছি, আপনার ভাবিকে নিয়ে নেপাল ট্যুর করবো।” আমি অবাক হয়ে বললাম, তাহলে কাঁদলেন যে ! -“আরে ওটা তো অ্যাক্টিং। ওরাও একটু বিব্রত থাকুক।” হেসে হেসে কথা গুলো বলে আমাকেও পরামর্শ দিলেন, “মাসুদ সাহেব এবার আপনিও ভাবিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।” চমকে

উঠলাম। আমতা আমতা করে বললাম, -"এসব ম্যানেজ করা তো ঝক্কির কাজ। টাকা অবশ্য কিছু জমানো আছে। আর তাছাড়া নাতি-নাতনিকে দেখাশোনা করতে হয়।" আমার কথা শেষ না হতেই তিনি বললেন, "আরে রাখেন তো এত দায়িত্ব,কর্তব্য পালন,একটু ছুটি নিন।"

আসলে আমার চেয়েও শাহানার খুব ইচ্ছে একটু দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার। বেড়াতে যাওয়া বলতে তো খুলনায় মেয়ের কাছে বছরে, দুবছরে যাওয়া হয়। মেয়ের পিঠাপিঠি বাচ্চা। মা এলে একটু মার কাছে বাচ্চাদের দিয়ে হাঁফ ছাড়ে মেয়েটা। আমি ঢাকায় ছেলের বাচ্চাদের দেখাশোনা করি। তাই আর বুড়ো-বুড়ি একসাথে কোথাও যাওয়া হয় না। ছেলে-মেয়েরা অবশ্য কয়েকটি দেশ ঘুরে এসেছে। খুব আনন্দ হয় ওদের দেশ-বিদেশের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শুনতে। শাহানা খুব আগ্রহ নিয়ে ওদের গল্প শোনে, ছবিগুলো বার বার দেখে। চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে নড়বড়ে গলায় বললাম, -"তা অবশ্য ঠিক,এবার একটা ছুটি নেওয়া প্রয়োজন।" আমার পিঠ চাপড়ে সাহস দেয়ার ভঙ্গিতে আতাহার সাহেব জানালেন, উনার এক ভাতিজার ট্রাভেল এজেন্সির বিজনেস আছে। সেই সব কিছু রেডি করে দিবে। তিনি আমার কথা জানিয়ে রাখবেন।

আতাহার সাহেবের ভাতিজা রুবেল ছেলেটি বেশ চটপটে। ওর ট্রাভেল এজেন্সি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার ভিসা টিকিটসহ অন্যান্য কাগজপত্র রেডি করে আজকে হাতে দিয়েছে। রুবেলের অফিস থেকে বের হয়ে যাওয়ার পথে কাছেই একটি শোরুমের শালটি দেখে চোখ আটকালো। এমন একটি নস্যি রঙের শাল বিয়ের পর শাহানাকে কিনে দিয়েছিলাম। শাহানা খুব পছন্দ করেছিল। আমার ছোট বোন নাসরিন শালটি পরে বন্ধুর বিয়েতে দাওয়াত খেতে গিয়ে হারিয়ে এসেছিল। শাহানা ননদকে মুখের উপর কিছু বলতে পারেনি, আড়ালে কেঁদেছিল। বিয়ের পর পুরান ঢাকায় জিন্দাবাহারের পৈতৃক বাড়িতে যৌথ পরিবাওে কয়েক বছর ছিলাম। শাহানা ময়মনসিংহের মেয়ে। পুরান ঢাকার রীতিনীতির সাথে ভালোই মানিয়ে নিয়েছিল। আমি অফিস থেকে ফিরলে হাত-মুখ ধোয়ার পানি গরম করে দেওয়া, জামা-কাপড় গুছিয়ে রাখা এসব কাজ খুব যত্ন করে করতো। বুঝতাম, এত লোকের ভীড়ের মাঝে এই যত্নটুকু আসলে ভালোবাসা প্রকাশের বাহন। একটু কাছে থাকার বাহানা। বিয়ের পর একদিন খুব আবেগে প্রথম যৌবনের ব্যর্থ প্রেমগাথা শোনাতে গিয়েছিলাম। শাহানা নির্বিকার

ভাবে সব শুনলো। কোনো সান্ত্বনা বাক্য নেই কিংবা রাগও নেই। ওকে এতটা ভাবলেশহীন দেখে মনটা ভারি হয়ে গেল। আমার ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী বলে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম ওর হাতটি আমি শেষ পর্যন্ত ধরে থাকবো । হারাতে দেব না। সেদিন মাঝরাতে ফোঁস ফোঁস কান্নার আওয়াজে ঘুম ভাঙলো। কিছুতে কান্নার কারণ বলে না। যাও বা বলতে চায় কান্নার তোড়ে সেটাও বোঝা যায় না। আমর দুশ্চিন্তা বেড়ে যেতে লাগলো। শেষটায় যা বুঝলাম তা হলো আমি এখনো সেই মেয়েটিকে মনে রেখেছি এটাই তার দুঃখের কারণ। আমার মেজাজ সত্যিই খুব খারাপ হলো। শাহানা সেটা বুঝতেও পারলো। এরপর দুই একবার হাসি ঠাট্টায় এ প্রসঙ্গ উঠলেও সময়ের সাথে এসব ছেলেমানুষী আবেগ চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ইদানিং রেগে গেলে শাহানা পুরোনো প্রসঙ্গ তোলে। শুনতে ভীষণ ক্লান্ত লাগে, বিরক্ত লাগে। মাঝে মাঝে ওকে বলি, "এ বয়সে এসব আবোল-তাবোল ভাবনার জন্যই তোমার প্রেশার এতটা বেড়ে যায়।"

ফেসবুক হয়েছে আরেক যন্ত্রণার উৎস। শাহানাদের হাঁটার গ্রুপের মিসেস পাটোয়ারি তার স্বামীর সাথে বেড়াতে গিয়ে একগাদা ছবি পোস্ট করেছে। ক্যাপশন দিয়েছে "শুধু দুজনে।" শাহানা ছবিগুলো দেখে থম ধরে থাকে। বিয়ের পর কক্সবাজার যাওয়ার টিকিট কেটেও শাহানাকে নিয়ে যেতে পারিনি। বড়ো চাচা অসুস্থ হলেন। একই পরিবারের মধ্যে থেকে এভাবে যাওয়াটা অশোভনীয়। শাহানা নিজেই তাই যেতে চাইল না। এত বছর পর শাহানার সেটাও দুঃখ, আমরা একসাথে কোথাও যাইনি। সত্যিই আমাদের দুজনের একান্তে কোথাও যাওয়া হয়নি। ওর খুব ইচ্ছে কোনো এক পাহাড়ে গিয়ে আমাকে নিয়ে ছবি তুলবে। ফেসবুকে পোস্ট করে ক্যাপশন দিবে, "লাইফ ইজ সো বিউটিফুল।"

বাসার কাছে চা-সিগারেটের একটা টং দোকান খুলেছে বেশ কিছুদিন হলো। হার্টের কিছুটা সমস্যা দেখা দেয়ার পর থেকে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আজকে খেতে ইচ্ছে করছে। দোকানের বেঞ্চে বসে দুটো টান দিতে না দিতেই পাশ থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে উঠলো, "আপনার কী কোনো আক্কেল আছে ?" ঘুরে তাকিয়ে দেখি আমার ছেলে তাহ্‌মিদ চোখ লাল করে তাকিয়ে আছে। দোকানে খুব বেশি লোক না থাকলেও তিন-চার জন তো আছেই। তারা উৎসুক চোখে চেয়ে আছে। তাহ্‌মিদ একটু গম্ভীর প্রকৃতির তবে কখনও এভাবে আমার সাথে কথা বলেনা। আমি কিছু বলার আগেই তাহ্‌মিদের পাশে থেকে নাসরিনের বড়ো ছেলে রাশেদ এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো -"মামা বাসায় চলেন।"

রাশেদের কান্না জড়ানো গলা আমার হাত পা অসাড় করে দিল। তাহমিদ এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বললো, "আব্বা আপনার ফোন বন্ধ কেন ?" আম্মার খবর ..... কথাটা শেষ করতে পারলো না। অস্থির এক কান্নার ঢেউ ওর সারা শরীরে। বাসার নীচে গ্যারেজের গেটে পাশের ফ্ল্যাটের এমদাদ সাহেব এসে কাঁধে হাত রাখলেন। আরও কিছু পরিচিত মানুষ। কে, কী বলছে কোনো শব্দই আমার কানে পৌঁছাচ্ছে না। আমি ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকি। অ্যাম্বুলেন্সে শাহানার নিথর দেহ। বাথরুমে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গিয়েছিল। সেখানে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। হসপিটাল থেকে কিছুক্ষণ আগে সব ফরমালিটি শেষ করে ওরা বাসায় এসেছে। আমার হাতে দার্জিলিং যাবার ভিসা, টিকিট আর নাস্যি রঙের শাল। যেটা পরে শাহানার ছবি তুলে পোস্ট দেওয়ার কথা ছিল। ক্যাপশন হতো, "লাইফ ইজ সো বিউটিফুল!"

## মানুষ

ফেরদৌস জ্যোতি

সবুজ মতিহার রূপের  বাহার ও বেশ। সে যাই হোক প্রতিদিনের মতো লতিফ  ভাইয়ের চা স্টল থেকে রং চা সাথে  লাড্ডু  ১ টাকার বিস্কুট  খেয়ে  আড্ডা  শেষ  করে হলে ফিরছি আগামীকাল পরীক্ষা হঠাৎ হল গেটে বড় এক আপুর সাথে  দেখা, কিরে এতো খোসমেজাজ এ থাকিস কি করে সিজিপিএ  ভালো  তুই ভালো আবৃত্তি  করিস, টুকটাক লেখিস,আবার দেখি হলের প্রোগ্রাম  থেকে প্রাইজ ও পাস বিসিএস এর জন্য  আবার পড়তেও দেখি আমরা তো ল্যাব নিয়েই পড়ে থাকি।।আরে আপু আমাদের  পড়াশোনা হচ্ছে  মন দিয়ে  আনন্দ  নিয়ে  পড়াশোনা  যতই পড়বেন  মাথাটা না চেপে ধরবে না শুধু  মনে হবে এটার পর কি হবে এমন হলে ভালো  হতো ইস রে কার্ল মার্কসের সাথে রবীন্দ্রনাথকে মেলানো যায়  না । আবার নতুন নতুন  বই কিনতে  গেলেও  আনন্দ আপনারা  তো লাইব্রেরী থেকে  বই নিয়ে  পড়াশোনা  করলেই শেষ  আমাদের  তো তা হয় না প্রতি বছর  কত বই,রেফারেন্স  বই,হল সেমিনার, বিভাগ সেমিনার, লাইব্রেরি থেকে  বই পড়েও শেষ  হয় না। তা তোরা কি শুধু  শিক্ষা  ক্যাডার আর লেকচারার, কবি,সাহিত্যিকই হোস রক্তি আপু খুব উপহাস করেই কথা বললেন।।।

আসলে সবসময়  অপমান  বা উপহাসের জবাব  অপমানকারীর মতোই হতে হয় না মুচকি  হাসি দিয়ে  বললাম আপু বাংলার বেশির  ভাগ  সৃজনশীল এদের  শুধু  শিক্ষা খাতেই না মানবাধিকার  কর্মী, আইনজীবী, ব্যাংকার,শিল্পপতি,উদ্যোক্তা,কর্পোরেট সেক্টর কোন জায়গায় এদের কে পাবেন না। আমাকে বললো তা তুই এতো কিছু  পারিস হবি টা কি। আপু সময়ই তো আসলে  উওর টা দিবে।।জীবনে কি হতে চাই সেটা পরের  কথা বেঁচে  থেকে নিজের  অবস্থান  তৈরি  করতে  হয়তো  সময় লাগবে  না কিন্তু  মানুষ হতে  সময় লাগবে  মৃত্যুর  পর পর্যন্ত।

## ইট কাঠ পাথর শহরে

জামিল রায়হান

যখন অতি প্রত্যুষ, মোরগ ফুলের মতো
ভোরের উদ্ভাস,চারদিকে সজীব নির্জনতা, পায়ে শিশির জড়িয়ে রমনার মেঠো বুকে প্রাণ সঞ্চারী ঘাসফুল স্বাগত জানায় এই দুদ্দাড় কোলাহলময় একটি অসাম্যের শহরকে।

ইট কাঠ পাথরের ভেতরেও যেন বিন্দু বিন্দু সোহাগি ঘাম জমে, শিউলির লালাভ নাকফুলে জমে থাকে ঝরে পড়ার অতল অভিমান, ভালোবাসা জমা হয় বুকের আঁচলে।

ইট কাঠ পাথরের এ শহরে কতো ভেদাভেদ, কতো ক্ষোভ, কতো অনাদর,তবুও বুকের ভেতর খুব চেনা অবিনাশী মায়ার পাহাড়।

এ শহর মাঝে মাঝে বিতৃষ্ণার অলীক নরক, নিঃশ্বাসে বিষ, স্বজন সুজন যেন অচেনা দুর্জন। তবু ঠিক বুকের পাঁজরে যেন টিকে থাকার অমোঘ লড়াই, চোখের পাতায় স্বপ্নমাখা প্রজাপতি রঙ।

ইট কাঠ পাথরের এ শহরেও দুর্ভোগ হয়ে বৃষ্টি নামে, রোদে পুড়ে মেহনতী মানুষের পিঠ, শীতল ছায়ায় রঙ মেখে ঘুরে ফিরে কোমল ফর্সা রমণীর দল।
এ শহরেও বুকের কোথাও যেন চার ছক্কা মারে উড়নচণ্ডী প্রেমিক প্রেমিকারা।

## কবিরাজ

আপেল আবদুল্লাহ

আমার অসুখের নাম মধুমেহ অধরা স্বপ্ন
আমার অসুখের নাম বয়স, সাদা চুল, ঝাপসা দৃষ্টি
আমার অসুখের নাম স্মৃতি- বিস্মৃতি, বেড়ে ওঠা, পরাজিত প্রেম
আমার অসুখের নাম সেদিনের মতো তাকে পাওয়া
আমার অসুখ চিন্তার মতো দেখা যায় না
স্বপ্নের মতো ধরা যায় না
অবগুণ্ঠনবতী নারীর মতো লাজুক কষ্ট
নিরাকার বিবেকের মতো উদোম হাওয়া
কবিতার মতো কুহকিনি কলা শুধু জ্বালায়

ইতোমধ্যে ডাক্তার জবাব দিয়েছেন এ্যালোপ্যাথিতে হবে না
লুকিয়ে লুকিয়ে হোমিওপ্যাথি খেয়েও কাজ হয়নি
শুনশান বিষণ্নতা, কে যেন চিৎকার দিল
পেয়েছি - পেয়েছি কবিরাজ- কবিরাজ

আমি এখন কন্টকারি ফুল ও ফলের নির্যাস সেবন করছি
আমি এখন লতা গুল্ম ভেষজ
নিমপাতা, বেলপাতা, তুলসী- হরীতকী গাঁজা ও কোকেনের চিকিৎসায় আছি

আমার কাশি কমেছে, মধুমেহ নিয়ন্ত্রিত
রক্তের দৌড়াদৌড়ি অনেক বেড়েছে
চুলে কলপ করেছি
আজকাল সুখনিদ্রায় স্বপ্ন দেখি কবিতার মতো
আমি কবিতার চিকিৎসায় আছি
শুশ্রুষার রাজকবি ,কবিরাজ- কবিরাজ

## গৌরবের গ্রাফিতি

বেলায়েত হোসেন বাবলু

ইট বালি সিমেন্টের নিবিড় বন্ধনে নির্মিত দেয়াল
লোনা বালি জলে শেওলার আবরণে
যুগপৎ সীমানার কথা বলে
রাখে অন্দরে অনন্ত সুরক্ষা
অথচ অঙ্গসৌষ্ঠবে আজ তুলির শিল্পিত আঁকিবুঁকি
দেয়ালে দেয়ালে দ্রোহের দাবি হয়ে
স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠে দুরন্ত গ্রাফিতি।

সেই কবে প্রাগৈতিহাসিক গুহার আঁধার ছিন্ন করে
বৈষম্যের দ্রোহ যাত্রা করেছিলো সাম্যের পথে
গুহার গতরে খচিত হয়েছিলো প্রাগ বিদ্রোহী বারতা
যেই যাত্রার আজও হয়নি সমাপন
বিক্ষুব্ধ মানুষ মিটিং মিছিল স্লোগানে
আজো গাইতে পারেনি মুক্তির জয়গান।

অগণিত শহীদের গনহত্যা, দহন ধ্বংস, লুণ্ঠন
সহিংস সময় চিত্রের আজ প্রতিবাদী গ্রাফিতি
স্বৈরাচারের ম্যাগজিন খসে বুলেটের খোসা
অঙ্কিত করে হাজারো ভিজ্যুয়াল গ্রাফিতি
ফ্যাসিবাদের ছররা ও শাণিত হয় অবলীলায়
জীবন বিনাশী রণের হিংস্র খেলায়
রঞ্জিত হয় হাজারো সাঈদ মুগ্ধের অকুতোভয় বুকের জমিন
হায় বাংলাদেশ! আমাদের স্বাধীনতা
অনুমতিহীন জনতার অভিমতে শিল্পীত সত্তায়
বৈষম্যে সাম্য দাও
যুক্তিতে শক্তি দাও
দ্রোহে প্রেম দাও
সঙ্কটে মুক্তি দাও
গ্রাফিতি বাংলাদেশ।

# চিঠি

নাসরিন পারবিন হীরা

জলতরঙ্গের মতো চিঠির ঢেউয়ে ভেসেছিলাম
কবে, কখন, কিভাবে,কেমন করে তা বর্ণনাতীত,
শুরু হয়েছিল আড়ম্বরপূর্ণ শেষ তার আত্মঘাতী
মরণে জলন্ত আগুনের শিখায় বিসর্জনে।

জীবনের গল্পে একটি অধ্যায় ছিলো-
চিঠির সাথে সখ্যতা, ধূম্রজালে আচ্ছন্ন স্বপ্ন
ভালোলাগার নীল খাম রঙিন কাগজের বাহার
মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে মনকে নাড়া দিতো।

অসম্ভব ভালোলাগা বোধ ছিলো চিঠির প্রতি
অন্তরের নিগূঢ়তম ভালোবাসা দিয়ে লিখতাম, নিশীথ রাতের শ্রাবণ ধারা মনকে উতলা
করে শরতের এক আকাশ নীল তখন হৃদয়ে আনাগোনা।

শীতের শিউলি ঝরার শুভ্র আমেজে বিভোর মন উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত অবাধ বিচরণ।
ফাগুনের আগুন লাগা কৃষ্ণচূড়ার পথে পথচলা
দখিনা সমীরণ জানান দিতো মনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে।

চিঠি আসবে জানি আসবে ভাবনায় অতিক্রান্ত সময় বয়ে যায় অনুরাগে অভিমানে।

ধীরে ধীরে কালের গর্ভে হারালো চিঠির লাবন্যতা,
সাক্ষী হিসেবে কিছু  ডাকবাক্স আজো পথের ধারে অপেক্ষমান।

আমার অন্তর জুড়ে হাজারো পাতার চিঠি
লেখা আছে, ঠিকানা অনন্তকালের।

## বিষাদময় সপ্তাহান্তের সন্ধ্যা
রমেন রায়

বড্ড শীত, নগরে উড়ছে
ধুলো আর বালি
কেবলই খাবি খাচ্ছে মন
তুমিও নেই তাই, এই
হৃদয় প্রকোষ্ঠ খালি।

মতিহার মানে তুমি আর আমি
প্যারিসের পথে হাঁটা
বিষাদের সাঁঝ লাগে না ভালো
সরাও পথের কাঁটা।

হাত বাড়ালেই তোমার ছায়া
কায়াহীন মায়াহীন
এমনি করেই কাটছে বেলা
কাটছে রাত্রি দিন।

আসবে কবে জলদি জানাও
রাখো হৃদয়ের দাবি
তোমার জন্য আকুল ব্যাকুল
মতিহার বাবি রাবি

## ইচ্ছে ঘুড়ি

মো. শিমুল পারভেজ

মাঝে মাঝে আমার সত্যিই মেঘ হতে ইচ্ছে করে
ওদের কোনো দেশ নেই,
ধর্ম বা সম্প্রদায় নেই
সীমারেখা নেই,
পাসপোর্ট নেই, ভিসা নেই;
হাসতে হাসতে বিস্তৃত দিগন্তে ওড়বার স্বাধীনতা আছে,
কষ্ট গুলো বৃষ্টি হয়ে ঝরিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে।
আবার জল হতে ইচ্ছে করে ভীষণ রকম
সবাই যখন উপরে উঠছে ওরা চলে নিচে!
রং নেই, গন্ধ নেই, বর্ণ বৈষম্য নেই,
গতি আছে ঝর্ণা থেকে নদী, নদী থেকে বিশাল জলধি
পরিষ্কার করা, পবিত্র করা, শীতল করার দায়ভার আছে।
পাহাড় হতেও যে মন্দ লাগে তা নয়!
বুকের ভেতর পাথর, মাটি, পানি ও সহস্র বৃক্ষ নিয়ে স্থির শান্ত, দৃঢ় সমতলের রক্ষক
কোনো রাগ বা ক্ষোভ নেই;
অনন্তকাল দাঁড়িয়ে আছে যেন ধৈর্যের মূর্তপ্রতিক
আবার ভাঙার স্বাধীনতা আছে; আছে দুঃখ উদগীরণের উপায়
শুধু তথাকথিত মানুষ হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না!

# ২০২৩-২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিভাগ আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি

"মায়াবী মতিহার" প্রথম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন ও সদস্যদের নতুন বছরের উপহার প্রদান অনুষ্ঠান, ২৪ নভেম্বর ২০২৩

"মায়াবী মতিহার" প্রথম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন ও সদস্যদের নতুন বছরের উপহার প্রদান অনুষ্ঠান, ২৪ নভেম্বর ২০২৩

"মায়াবী মতিহার" প্রথম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন ও সদস্যদের নতুন বছরের উপহার প্রদান অনুষ্ঠান, ২৪ নভেম্বর ২০২৩

আগারগাঁওয়ে জয়তুন রেস্টুরেন্টে "মায়াবী মতিহার" প্রথম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান শেষে সদস্যগণ, ২৪ নভেম্বর ২০২৩

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ও পিঠা উৎসব, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ও পিঠা উৎসব, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ও পিঠা উৎসব, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ও পিঠা উৎসব, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পিকনিকে ঢাকা বিভাগের স্টল, ০২ মার্চ ২০২৪

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পিকনিকে ঢাকা বিভাগের স্টল, ০২ মার্চ ২০২৪

ফেনীর বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে ঢাকা বিভাগ, ২৬ আগস্ট ২০২৪

ফেনীর বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে ঢাকা বিভাগ, ২৬ আগস্ট ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরনো দিনের গান নিয়ে বিশেষ পরিবেশনা “জলছবি”, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরনো দিনের গান নিয়ে বিশেষ পরিবেশনা “জলছবি”, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরনো দিনের গান নিয়ে বিশেষ পরিবেশনা "জলছবি", ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরনো দিনের গান নিয়ে বিশেষ পরিবেশনা জলছবির কুশীলবগণ, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা বিভাগের পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৫ অক্টোবর ২০২৪

# ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিভাগ আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, ইফতার মাহফিল ও বিভাগীয় কমিটি-ঢাকা গঠন অনুষ্ঠান, ০৮ এপ্রিল ২০২৩

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান, বিভাগীয় কমিটি-ঢাকা, ১৩ মে ২০২৩

বিভাগীয় কমিটি-ঢাকার ওয়ার্কশপে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণী আলোচনা, ১০ জুন ২০২৩

ফল উৎসবে সদস্যদের ফলাহার, ১৬ জুন ২০২৩

ঢাকা বিভাগ আয়োজিত ইদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের সাধারণ সম্পাদক, ২১ জুলাই ২০২৩

ঢাকা বিভাগ আয়োজিত ইদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের সভাপতি ও বিভাগীয় কমিটি-ঢাকার সভাপতি, ২১ জুলাই ২০২৩

বাংলা পরিবার
ইদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, ঢাকা বিভাগ, ২১ জুলাই ২০২৩

ঢাকা বিভাগ আয়োজিত ইদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বন্ধুদের একসাথে পেয়ে উচ্ছ্বাস, ২১ জুলাই ২০২৩